জুন ২০২২ ■ জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় ১৪২৯

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ

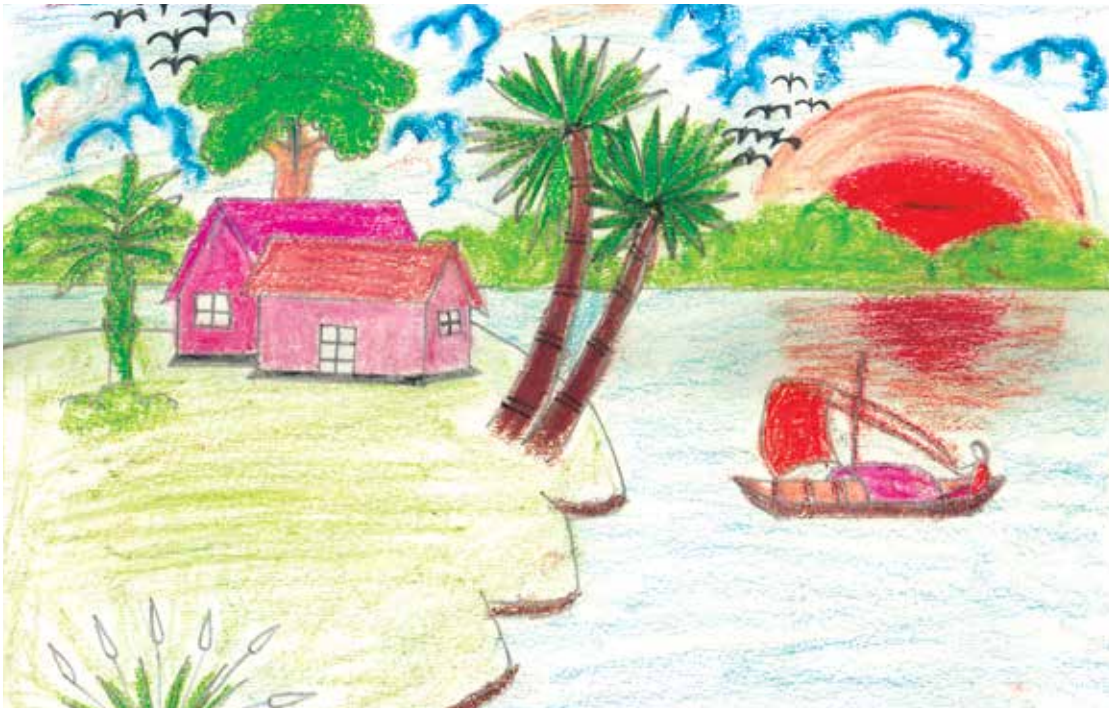

মৌমিতা আক্তার বন্যা, ৫ম শ্রেণি, নতুন কুঁড়ি কিন্ডারগার্টেন, নকলা, শেরপুর

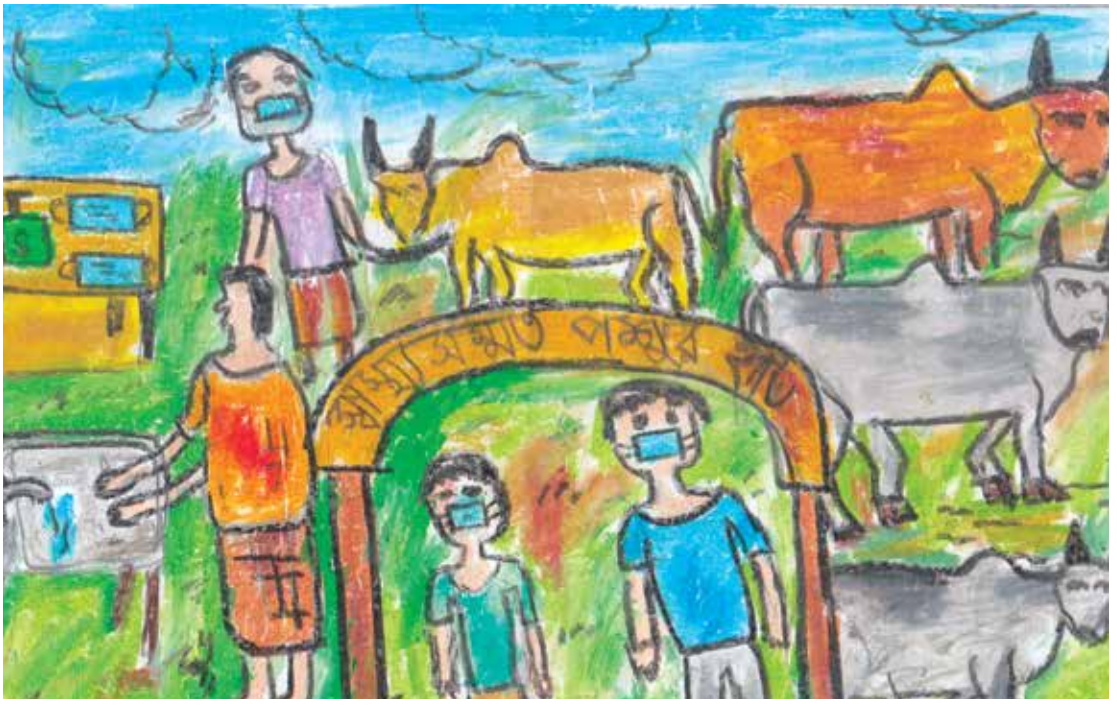

রাফিদ রাফসানী, ১০ম শ্রেণি, বি.এ.এফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব পরিবেশ দিবস নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়।

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) নেতৃত্বে ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ই জুনকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। আমাদের বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার জন্য সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ খুবই প্রয়োজন। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'অনলি ওয়ান আর্থ' যা বাংলা করলে দাঁড়ায় 'শুধু একটাই পৃথিবী'। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্যের পাশাপাশি অন্তর্নিহিত ধারণা হিসেবে 'প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই জীবনযাপনের' ওপর জোর দেওয়ার কথাও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

দেশকে সবুজে শোভিত করতে এবারের জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২২-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'বৃক্ষপ্রাণে প্রকৃতি-প্রতিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ'। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ বিষয়ে খুবই সোচ্চার। এ ব্যাপারে তিনি সবসময়ই বিশেষ করে প্রতি বছরই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দেশের বৃক্ষরোপণের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং নিজেও গাছ লাগান।

বন্ধুরা, পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে আমাদেরও পরিবেশ সুরক্ষায় যার যার অবস্থান থেকে একযোগে কাজ করতে হবে। বাড়ির আঙিনায় বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

২১শে জুন বিশ্ব বাবা দিবস। বাবা দিবসে বিশ্বের সকল বাবাদের প্রতি রইল ভালোবাসা। ভালো থেকো বন্ধুরা, ভালো রেখো তোমাদের পরিবেশ।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

নিবন্ধ

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ/ড. আবদুল আলীম তালুকদার ০৩
পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের ভাবনা/আমিরুল হক ০৭
স্বপ্নের আলোয় উদ্ভাসিত রূপালি পদ্মা/ মুহা. শিপলু জামান ১০
জিআই পণ্য ইলিশ/ মোহাম্মদ জারিফ ১৫
এসডিজি অর্জনে জেন্ডার বাজেটের গুরুত্ব/হাছিনা আক্তার ২৫
শিশুশ্রম নিরসনে করণীয়/তানজিনা আক্তার ২৭
বাদামের খোসা/রকিবুল ইসলাম ৩১
বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ-ঐতিহাসিক ছয় দফা/হোমায়েদ নাসের ৩৩
স্কুলে হোক আনন্দের বাগান/মৃত্যুঞ্জয় রায় ৩৮
বাবার কথা/ মেজবাউল হক ৫১
গাছ বাড়ি/আতিকুল ইসলাম ৫৪

গল্প

এলিয়েন বন্ধু/আখতারুল ইসলাম ১৭
পাতলাদার কাক কারখানা/মনি হায়দার ১৯
শুঁয়াপোকাদের বোকামি/মাহমুদ জামিল ২৯
ভাষা-দাদুর সঙ্গে ধ্বনির অর্থ/তারিক মনজুর ৩৪
ঠর্‌র ঠক/সুলতানা লাবু ৪৭
বাবার বুক ভরা স্নেহ/নাসিম সুলতানা ৪৯

বড়োদের কবিতা

রোকসানা গুলশান/ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান/রিহান আহমেদ ০৯
এম ইব্রাহীম মিজি/প্রজীৎ ঘোষ/মাসুমা জাহান ২৩
জাকারিয়া আব্দুল্লাহ/ইমরান পরশ/ইমরান খান রাজ ২৪
জাওয়াদুল ইসলাম ভুঁইয়া ৪০
সাবিত্রী রানী ৪৬

সাফল্য প্রতিবেদন

৫৬ এক পায়ে স্কুল যাওয়া/আবদুর রহমান
৫৭ বন্যায় সচেতনতা/মো. জামাল উদ্দিন
বিনা সুদে ঋণ/জান্নাতে রোজী
৫৮ বিস্ময় বালক রুশো/শাহানা আফরোজ
আয়রনম্যান আরাফাত/তৈয়বুর রহমান
৫৯ টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা লিটন/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৬০ আমরাও সাঁতার শিখব/সাবিনা ইয়াসমিন
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

ছোটোদের লেখা ও ছড়া

১৬ মনিরা ইউসুফ
৫২ হামিদ আবরার/মেশকাউল জান্নাত
৫৩ ওয়াহিদ মুস্তাফা

স্মৃতিকথা

৩৬ গ্রামের সরল পথে ভালোবাসার শৈশব/রেজা নওফল হায়দার

মুক্তিযোদ্ধের কিশোর উপন্যাস

৪১ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মৌমিতা আক্তার বন্যা/রাফিদ রাফসানী
তৃতীয় প্রচ্ছদ : মো. রাকিব হোসাইন/জান্নাতুল আবেদীন হৃদি

৩২ মুয়াজ হোসেন
৫২ মিরাজুল ইসলাম
৫৬ আবু সালেহ
৬০ শারিকা তাসনিম নিধি
৬৩ নাজিবা সায়েম/মোহাম্মদ ইয়াবুব বর্ণ
৬৪ সানজিদা আক্তার/তাশদিদ তাবাসুম আশফিয়া

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় Nobarun Potrika আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে।

এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমাদের বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবহাওয়ার বেশ পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা দিনকে দিন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সাথে কয়েক বছর ধরে যোগ হয়েছে অতিমারী করোনা ভাইরাসের নানান রূপ। আর এই প্রকৃতির বৈরি আচরণের বড়ো শিকার হচ্ছে মানবজাতি। এসব দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। উন্নত বিশ্বে উন্নয়নের মহাযজ্ঞে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অনবরত কার্বন নিঃসরণ বাড়ছে। এ কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতাও বাড়ছে সমান হারে। পাশাপাশি বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ায় ক্রমশ মেরু অঞ্চলের বরফ গলে বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। এতে জলবায়ুর উপরও পড়ছে বিরূপ প্রভাব। জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির অন্যতম প্রধান শিকারে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক তাপমাত্রা অতিমাত্রায় বৃদ্ধির কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তাতে প্রাণ-বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ (কালবোশেখি, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়) একটি নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য প্রধানত পরিবেশ দূষণকেই দায়ী করেছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ।

পরিবেশ দূষণ হলো মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে পরিবেশের উপাদানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ হলো– জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুত শিল্পায়ন, বনজ সম্পদের ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্র নিঃসরণ, সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, যানবাহনের বিষাক্ত ধোঁয়া, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা, গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। সাধারণত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এ দুভাবে পরিবেশ দূষিত হতে পারে। প্রাকৃতিক দূষণের

মধ্যে রয়েছে সীসা, পারদ, সালফার-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোআক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) প্রভৃতি।

বায়ু প্রকৃতির এক অফুরন্ত নিয়ামক। বায়ু ছাড়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষই নয় বরং সমস্ত জীবকুলের এক মুহূর্ত বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু তারপরেও এ বায়ুই আজ নানাভাবে দূষিত হয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এক বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন জ্বালানি; যেমন– তেল, গ্যাস, কয়লা, কাঠ, লতাপাতা পুড়ে প্রতিনিয়তই বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, জীবাশ্ম জ্বালানি, রাসায়নিক পদার্থ-এর পোড়া ধোঁয়া বায়ুকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এতে করে অসময়ে বর্ষণ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অকাল বন্যার মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হচ্ছে। ধোঁয়া, ধুলিকণা ও নানাবিধ দূষণের কারণে মানুষের নানাবিধ রোগব্যাধি; যেমন- মাথা ধরা, শ্বাসকষ্ট, স্ট্রোক, হাঁপানি, চর্ম রোগ, যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যানসার ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও পৃথিবীর এই অনাকাঙ্ক্ষিত উষ্ণায়ন– তথা দূষণের কারণে ওজন স্তর ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে এই ভূ-ভাগে বিনা বাধায় সূর্যের ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি চলে আসার দ্বারপ্রান্তে, যা এই পৃথিবী নামক গ্রহবাসীর জন্য রীতিমতো অশনি সংকেত।

বায়ু দূষণের মূলে রয়েছে কলকারখানা, মোটর গাড়ি, ট্রেনের জ্বালানি পুড়ে বিষাক্ত ধোঁয়া, ঘরবাড়ি ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উত্তাপ সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি এবং নানান আবর্জনা। বিভিন্ন অক্সাইড বাতাসের জলীয়বাষ্পের সঙ্গে মিশে তৈরি করে সালফার এবং নাইট্রোজেনের অম্ল। এই অম্ল নিচে নেমে এসে পানি ও মাটির সঙ্গে মিশে যায়; এরই নাম এসিড বৃষ্টি। বায়ু দূষণের বিপর্যয় সম্পর্কে পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করেছেন, বায়ুতে যদি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে আর তার ফলে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের গড় তাপমাত্রা যদি ২০০ সে. বৃদ্ধি পায় তবে উত্তর সাগরের বরফ গলে সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া পরিবেশ দূষণকারী কয়লার ধোঁয়া ও ধুলোবালি যদি প্রাণদায়ী সূর্যালোককে পৃথিবীতে পৌঁছুতে বাধা দেয়, তবে তার ফল হবে আরও ভয়াবহ। যদি এ কারণে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসার পরিমাণ ১.৫% থেকে ২% কমে যায় তাহলে ক্রমান্বয়ে মেরু অঞ্চলের চিরস্থায়ী বরফ ছড়িয়ে পড়বে বিষুব অঞ্চল পর্যন্ত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এতে ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী ১৯টি জেলার দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলের প্রায় ২ কোটি মানুষ বাস্তুহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পরিবেশ রক্ষার জন্যে যে-কোনো দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৬% বনভূমি রয়েছে। সুতরাং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যে আমাদেরকে এ মুহূর্তে দেশের মোট আয়তনের ৩০% জায়গা বনায়নের আওতায় আনা অতীব প্রয়োজন।

বৃক্ষ আমাদের পরম বন্ধু। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রেই বৃক্ষের উপযোগিতা অপরিসীম। উপরন্তু তার সৌন্দর্যে হৃদয় আপ্লুত হয়, মনে প্রফুল্লতা আনে, ফলমূলসহ বৃক্ষের অন্যান্য উপাদান জীবের বেঁচে থাকার অন্যতম পাথেয়। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে সবুজ-শ্যামল পৃথিবীর অস্তিত্ব আজ প্রায় বিপন্ন। বিষাক্ত গ্যাসের কবলে পৃথিবীর বাতাস হয়ে উঠেছে ভারি এবং প্রাণীর জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। ঠিক এমনই সময় বিজ্ঞানীগণ এ সুন্দর ভুবনকে সুরক্ষার জন্য, প্রাণিজগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য একটিমাত্র

পথ আবিষ্কার করলেন, আর তা হলো 'বৃক্ষরোপণ'।

গাছপালা খাদ্য তৈরির সময় সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ হতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। উপজাত হিসেবে অক্সিজেন ত্যাগ করে। সমগ্র মানবকূল বায়ুমণ্ডল হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। উদ্ভিদ যদি সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন ত্যাগ না করত তবে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যেত। প্রাণিকুল ধ্বংসের মুখে পতিত হতো। সুতরাং প্রাণীর স্বাভাবিক শ্বাসকার্যে সহায়তা করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। যে এলাকায় গাছ থাকে না, সে এলাকা রুক্ষ মরুভূমিতে পরিণত হয়। জীব-বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব রক্ষায় গাছের ভূমিকা অতুলনীয়। প্রায় সব গাছেই রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার উপাদান। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় তাল জাতীয় গাছের (খেজুর, সুপারি, নারিকেল, পাম) রয়েছে অপরিসীম সক্ষমতা। এসব গাছের পাতা বাতাসের গতিবেগ কমিয়ে দেয়। খুব উঁচু হয় বলে বজ্রপাত প্রতিহত করে। এছাড়া তাল জাতীয় গাছ সব ধরনের

মাটিতেই ভালো জন্মায়। কোনো পরিচর্যা ছাড়াই এসব গাছ নিজস্ব শক্তিতে সোজা ও ওপরের দিকে লম্বা হয়ে ওঠে। রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ তেমন চোখে পড়ে না এবং এ জাতীয় গাছের তলায় অন্য ফসলও আবাদ করা যায়।

সর্বশেষ গত ২০১৭ সালের মে মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় উপরোল্লিখিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি বজ্রপাতকেও বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বজ্রপাতে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের প্রাণহানী হলেও আগে সরকারি নথিতে বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বিগত কয়েক বছর যাবত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বজ্রপাত বেড়ে যায়। বিশেষ করে জামালপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, সিরাজগঞ্জ, নরসিংদী, কুমিল্লা এবং সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে বজ্রপাত বেশি হয়। নেত্রকোনা, নরসিংদী ও কুমিল্লা মিলে দেশের এই মধ্যাঞ্চলকে 'বজ্রপাতের হটস্পট' বলে মনে করেন আবহাওয়াবিদরা।

এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিক যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, বিশেষ করে তাল জাতীয় গাছ বেশি পরিমাণে রোপণ করে তাহলে বজ্রপাতসহ প্রাকৃতিক অনেক দুর্যোগ থেকে বহুলাংশে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইসলাম ধর্মেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষ তাগিদ প্রদান করেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বেশি বেশি বৃক্ষরোপণের কথা বলেছেন। কেননা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এজন্য বিনা প্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন বা বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত ছিঁড়তে মহানবী (সা.) নিষেধ করেছেন। তিনি যুদ্ধকালীন অবস্থায় বৃক্ষ কর্তন ও ফসল বিনষ্ট থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। একজন সাহাবী একটি গাছের পাতা ছিঁড়লে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন,- 'গাছের প্রত্যেকটি পাতা সর্বদা আল্লাহর গুণকীর্তন করে থাকে; কাজেই অপ্রয়োজনে পাতা ছিঁড়বে না'। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমান যদি একটি বীজ বপণ করে অথবা একটি গাছের চারা রোপণ করে এবং পরবর্তীতে ঐ গাছটিতে ফলফলাদি জন্মালে তা যদি কোনো মানুষ, পাখি অথবা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে তবে তা তার জন্য সদ্কায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে (বুখারী ও মুসলিম)। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) আরো বলেছেন, তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে আগামীকাল নিশ্চিত কিয়ামত সংঘটিত হবে; তা জানার পরও সেদিনই কমপক্ষে দুটি গাছের চারা রোপণ করো।

গাছপালা বায়ুদূষণ রোধ করে। বায়ু থেকে দূষিত গ্যাস শোষণ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বায়ু অপরিহার্য উপাদান। আর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন। বায়ু যাতে দূষিত না হয় সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

তাই পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তথা এই সুন্দর পৃথিবীকে সকল প্রাণীর জন্য নিরাপদ রাখতে বৃক্ষরোপণ করা অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে সকল নাগরিক যার যার অবস্থানে থেকে বৃক্ষরোপণে সচেষ্ট হলে এ ধরার সকল প্রান্তে শান্তির সুবাতাস বইবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ■

কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক
শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে

পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের ভাবনা

আমিরুল হক

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আর এই পরিবেশকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের সবার। এই দায়িত্ব পালনের জন্য যেসব গুণাবলি একজন নাগরিকের থাকা প্রয়োজন তা হলো মন ও মানসিকতা, বিবেক, রুচিবোধ, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সুস্থ এবং সুন্দর চিন্তাধারা, ধৈর্য, ভালো আচরণ এবং ইচ্ছা নামক স্বচালিত এক প্রকার শক্তি। এসব গুণাবলি

পরিবেশকে সুন্দর রাখতে সাহায্য করে।

আমার বাড়ির নোংরা পচা ময়লা আবর্জনা যদি রাস্তায় অথবা যেখানে সেখানে ফেলে রাখি তাতে কার কী আসে যায়, এতে কে অসুস্থ হলো, কে হলো না, কার অসুবিধা হলো, কার হলো না তো আমার কী, বলে যদি উড়িয়ে দেই তাহলে কী হতে পারে একবার ভাবো তো? নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে একটা কথা আছে। তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া তো দূরের কথা একেবারে যদি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে চলি তাহলে বুঝতেই পারছ যা হবার তা-তো হবেই, কী বলো?

শুধু কি তাই- আজকাল চলতে-ফিরতে পথেঘাটে প্রায়ই দেখা যায় পায়ে চলার পথ আগলে ইচ্ছামতো দোকান বসানো হচ্ছে, ওয়েলডিং-এর কাজ করা হচ্ছে, বাড়িঘর নির্মাণের মালামাল যত্রতত্র রাখা হচ্ছে। এতে করে পথিকের পথ চলা এমনকি গাড়ি-ঘোড়া পর্যন্ত চলাচলে বিঘ্ন হয়। এতে আশপাশের পরিবেশ হচ্ছে নষ্ট। অথচ একটু ইচ্ছা করলেই বা একটু সচেতন হলেই কিন্তু আমরা পরিবেশটাকে সুন্দর করে রাখতে পারি।

আমরা হয়ত মনে করতে পারি পরিবেশ দূষণের মূল কারণ বোধ হয় বাড়িঘরের ময়লা আবর্জনা, তা নয়। তবে বাড়িঘরের ময়লা আবর্জনা থেকে কিন্তু পরিবেশ যে দূষণ হচ্ছে এ কথাও তো সত্য। এছাড়াও আরো অনেক কারণ রয়েছে যেমন– হাটবাজারের দৈনন্দিন আবর্জনা, গবাদি পশুর জবাইকৃত রক্ত, মলমূত্র, নাড়িভুড়ি ইত্যাদি তো আছেই। এরপর রাস্তাঘাটে যানবাহনের কালো ধোঁয়া, শিল্পকারখানার বয়লারের নির্গত কালো ধোঁয়া, কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য, কৃষি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের নিঃসৃত পানি প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে বায়ু, খালবিল, নদনদী ও পরিবেশ দূষণ করছে।

শহর অঞ্চলের রাস্তায় বের হলে গাড়ির হাইড্রোলিক, হর্নের তীব্র আওয়াজে শব্দ দূষণে অসংখ্য মানুষের শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে বধিরতার শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে ছোটো ছোটো শিশুদের উপর এর প্রভাব পড়ে বেশি। এসবের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতা সর্ম্পকে জানা সত্ত্বেও আমরা যেন ভ্রূক্ষেপই করি না।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে যানবাহন সেই সাথে বাড়ছে বাড়িঘর, দালানকোঠা, অফিস-আদালত এবং কর্ম পরিসর। সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হচ্ছে এবং প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সত্যি কথা বলতে কী প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ বা প্রতিকার করা বিষয়ে কোনো মানুষের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। তবে সামাজিক পরিবেশ রক্ষার্থে এককভাবেও অনেক কিছু করার আছে।

আবহাওয়াবিদরা এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সব সময়ই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে আসছেন এই বলে যে, বায়ুমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি, ওজোন স্তরের অশুভ পরিবর্তন, পানি দূষণ, বায়ু দূষণ এসব হচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী বনাঞ্চল না থাকার কারণে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয় বার বার ঠিক একই কারণেই হচ্ছে। প্রাকৃতিক এই অস্থিরতাকে রোধ করার জন্য সমস্ত পৃথিবী এখন সোচ্চার। তাই জ্বালানি হিসেবেই হোক অথবা অন্যান্য প্রয়োজনেই হোক বৃক্ষনিধন বন্ধ করতে হবে। তা না হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার বিকল্প কোনো পথও থাকবে না এটা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে।

গাছের গুরুত্ব অপরিসীম একথা ভুলে গেলে চলবে না। বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের যতটুকু সামর্থ্য আছে তাই নিয়ে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় মোকাবিলা করতে হবে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয় ঠেকাতে একক প্রচেষ্টায় না হোক অন্তত হাতের নাগালে থাকা সামর্থ অনুযায়ী দুটো গাছের চারা লাগিয়ে আমরা কি পারি না আমাদের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়ন করতে এবং সুন্দর রাখতে? যেখানে প্রয়োজন হয় না অনেক অর্থের, দরকার হয় না আধুনিক প্রযুক্তিগত সহায়তার। যেখানে আমাদের সামান্য একটু সদিচ্ছাই যথেষ্ট। ইচ্ছা নামের শক্তির সাথে নিজের বিবেককে কাজে লাগিয়ে আমরাই তো পারি আমাদের চারপাশের সামাজিক পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে সুন্দর রাখতে। ■

সাবেক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বেতার

কবিতায় পরিবেশ

পরিবেশ

রোকসানা গুলশান

ফুল, পাখি আর গাছের জন্য
নদীর জন্য মায়া!
সবার মুখের হাসির জন্য
চাই যে সবুজ ছায়া।

ছায়ায় যদি থাকতে চাই
মায়ার সবুজ বুনি
প্রিয় হবে দেশের মাটি
বলছে যে টুনটুনি।

পরিচ্ছন্ন করব নিজে
আমার চারিপাশ
সচেতনেই চলি-ফিরি
নইলে তো সর্বনাশ!।

ফুটবে ফুল, হাসবে শিশু
গাইবে পাখি বনে!
এই পরিবেশ হবে সুন্দর
আমারই যতনে।

গাছ লাগাই

রিহান আহমেদ

গাছে গাছে ভরে দিব
আমাদের ঘরবাড়ি
বেশি বেশি লাগাব গাছ
খালি স্থানে সারি সারি।

বনজ, ঔষধি ছাড়াও
লাগাব ফল গাছ
খালি জায়গা ভরে দিব
আমাদের চারপাশ।

৭ম শ্রেণি, মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারি

আমাদের পরিবেশ

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

ঘর বাড়ি, স্কুল দেখি
বন পাখি ফুল দেখি
স্থল দেখি
জল দেখি
মাছ দেখি গাছ দেখি আরো
লতাপাতা বৃক্ষের সবুজের রং দেখি গাঢ়।

নদীনালা খাল দেখি
গাছপালা ডাল দেখি
হাট দেখি
মাঠ দেখি
খেলা দেখি মেলা দেখি সুখে
ফসলের খেতে রোজ কিষাণের হাসি দেখি মুখে।

আকাশের মেঘ দেখি
বাতাসের বেগ দেখি
আলো দেখি
কালো দেখি
ধান দেখি বান দেখি যত
চাঁদ তারা সুরুজের হাসি দেখে মায়া লাগে তত।

সাগরের ঢেউ দেখি
জংলার ফেউ দেখি
হাঁড়ি দেখি
গাড়ি দেখি
সুখ দেখি দুখ দেখি বেশ
সবকিছু নিয়ে হলো আমাদের প্রিয় পরিবেশ।

স্বপ্নের আলোয় উদ্ভাসিত রুপালি পদ্মা

মুহা. শিপলু জামান

স্বপ্নের মতো সাজানো-গুছানো, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর রূপলাবণ্যে ভরপুর, সুজলা-সুফলা, নদীমাতৃক এক দেশ– যে দেশে ভোর হয় হরেক রকম পাখির কলকাকলিতে, যে দেশে ছয় ঋতু ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসে রাঙিয়ে দেয় মানুষের মন, যে দেশের মানুষ নানান বাধা, বিপত্তি ও দুর্যোগের সাথে লড়াই করেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, যে দেশে কৃষক নিজে কষ্ট করে অন্যের আহার উৎপাদন করে, কিন্তু মুখে থাকে রাজ্য জয় করা হাসি- বন্ধুরা তোমরা কী সে দেশের নাম জানো। হ্যাঁ- ঠিক বলেছ, সাড়া বিশ্বের বিস্ময়– আমাদের এই বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে ৩০ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ জন্ম নেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এদেশকে গঠন করেছে বাংলার মেহনতি, পরিশ্রমী ও দেশপ্রেমিক জনগণ। জাতির পিতার স্বাধীন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে উন্নত জাতির মর্যাদা দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যার গতিশীল ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে, স্বীকৃতি পেয়েছে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের। এমনিভাবে একের পর এক উপহার দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে করছেন আধুনিক-উন্নত রাষ্ট্র আর আমাদের করেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এমনি এক বিস্ময় অবদান হলো নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি পদ্মাসেতু। তোমরা নিশ্চই জানো নদীমাতৃক বাংলাদেশে জালের মতো প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। যার মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, ইছামতি, বুড়িগঙ্গা ইত্যাদি প্রধান। এবার নবারুণের বন্ধুদের জন্য পদ্মা নদী সংক্রান্ত কিছু মৌলিক তথ্যাবলি দেই যা তোমাদের জ্ঞানকোষকে করবে সমৃদ্ধ।

পদ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী। এটি হিমালয়ে উৎপন্ন। গঙ্গা নদীর প্রধান শাখা এবং বাংলাদেশের ২য় দীর্ঘতম নদী, যার দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী এই পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। রাজা রাজবল্লভের কীর্তি পদ্মার ভাঙনের মুখে পড়ে ধ্বংস হয় বলে পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা। পদ্মার প্রধান উপনদী মহানন্দা ও

পুনর্ভবা। মহানন্দা উপনদীটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এবং পুনর্ভবা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পদ্মার বিভিন্ন শাখা নদীর মধ্যে গড়াই, আড়িয়ালখাঁ, কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব ইত্যাদি অন্যতম। আবার পদ্মার বিভিন্ন প্রশাখা নদীসমূহ হলো– মধুমতী, পশুর, কপোতাক্ষ ইত্যাদি। এই নদীগুলো কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি জেলার উপর দিয়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। পদ্মার সর্বোচ্চ গভীরতা ১,৫৭১ ফুট (৪৭৯ মিটার) এবং গড় গভীরতা ৯৬৮ ফুট (২৯৫ মিটার)। [তথ্যসূত্র: বাংলা বিশ্বকোষ]

পদ্মা বিশ্বে অন্যতম খরস্রোতা নদী, পানি প্রবাহের বিবেচনায় দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের পরই পদ্মা নদীর স্থান। প্রতি সেকেন্ডে পদ্মায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কিউসেক মিটার পানি প্রবাহিত হয়। পানির তীব্রগতির ফলে পদ্মার তলদেশে ভাঙনের মাত্রাও অনেক বেশি। তাই তো পদ্মার গভীরতা ও স্রোতের বিশালতা এখনো রহস্যময়। বর্ষাকালে অতিরিক্ত স্রোতের সময় পদ্মার তলদেশের মাটি বালির মতো ধুয়ে চলে যায়, যার পরিমাণ প্রায় ৬৫ মিটার বা ২১৩ ফুট অর্থাৎ ২১ তলা ভবনের সমান উচ্চতার মাটি যা পৃথিবীতে রেকর্ড। এমন বৈরিতার সাথে লড়াই করে এবং দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে দেশের মানুষের টাকায় তৈরি করা হয়েছে আজকের পদ্মা সেতু। যা একসময় ছিল শুধু স্বপ্ন ও অধরা, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। পদ্মা সেতু হয়েছে দৃশ্যমান। আবারো প্রমাণিত হয়েছে, যে জাতি মাতৃভাষা ও স্বাধীনতার জন্য অকপটে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারে, সেই বাঙালি জাতি খরস্রোত ও প্রমত্তা পদ্মার গভীরতাও জয় করতে পারে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ বাস্তব, বাংলা ও বাঙালির সাহসী অগ্রযাত্রার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

পদ্মা সেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেলসেতু। সেতুটির কেন্দ্র ঢাকার সাথে মুন্সিগঞ্জ হয়ে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলাকে যুক্ত করেছে। ফলে পদ্মা সেতু এনে দিয়েছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন। বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সাথে ঢাকার যোগাযোগ হয়েছে অনেক সহজ। এই সেতু দেশের দক্ষিণাংশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশাল ভূমিকা রাখবে। পদ্মা সেতু শুধু নদীর দুই পাড়ের মানুষদেরই একসূত্রে বাধে নাই, বাংলাদেশকে যুক্ত করেছে অনেক দেশের সাথে। কীভাবে? শোনো- পদ্মা সেতু তৈরিতে কাজ করেছে অনেক বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও কর্মী, ব্যবহৃত হয়েছে বিদেশ থেকে আনা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও মানসম্পন্ন উপকরণ। পদ্মা সেতু প্রকল্পে ২০টি দেশের যেমন– অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, চীন, জাপান, হংকং, ইতালি ইত্যাদি দেশের মানুষ সরাসরি যুক্ত ছিলেন, ১০টি দেশের বিপুল সংখ্যক ও প্রায় ৫০ টি দেশের কিছু না কিছু উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। [তথ্যসূত্র : প্রথম আলো, ২১শে জুন ২০২২]

পদ্মা বহুমুখী সেতুর সম্পূর্ণ নকশা প্রণয়নে সিওএমের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শকদের নিয়ে গঠিত একটি দল তৈরি হয়। অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে ১১ সদস্যের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। এ প্যানেল সেতুর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকর্তা, নকশা পরামর্শক ও উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করেছে। পদ্মা সেতুর বিশদ নকশা করা হয় হংকংয়ে এবং নেতৃত্ব

দেন ব্রিটিশ নাগরিক রবিন, শ্যাম, যিনি লম্বা স্প্যানের সেতুর নকশা প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ। আর এ কাজে ব্যবস্থাপক হিসেবে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার কেন হুইটলার। এছাড়াও কাজ করেছে একটি স্টিয়ারিং ও একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি। পদ্মা সেতুর মূল কাজগুলো ছিল মূল সেতু, নদী শাসন, জাজিরা সংযোগকারী সড়ক, মাওয়া সংযোগকারী সড়ক, টোলপ্লাজা ইত্যাদি। নদী শাসনের নকশা প্রণয়নে ছিলেন কানাডার ব্রুস ওয়ালেস আর সেতু নির্মাণ কাজের তদারকি করেন নিউজিল্যান্ডের রবার্ট জন এভস। (তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও দৈনিক প্রথম আলো, ২১শে জুন ২০২২)

দুই স্তরবিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাসের এই সেতুর উপরের স্তরে চার লেনের সড়কপথ এবং নিচের স্তরে একটি একক রেলপথ আছে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬.১৫০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকায় ৪২টি পিলার ও ৪১টি স্প্যানের মাধ্যমে মূল অবকাঠামো তৈরি করা হয়। প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১৫০মিটার ও ওজন ৩২০০ টন। সেতুটির ভায়াডাক্ট ৩.১৮ কিলোমিটার (সড়ক) ও ৫৩২ মিটার (রেল)। মোট ১৮ কিলোমিটারের সংযোগ সড়ক দুটি-মাওয়া ও জাজিরা এবং দুই পাড়ে নদী শাসন মোট ১২ কিলোমিটার। পানির স্তর থেকে অত্যাধুনিক এই সেতুর উচ্চতা ৬০ ফুট এবং পাইলিং গভীরতা ৩৮৩ ফুট। প্রথমদিকে সেতু নির্মাণকারী প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের পদ্মা নদীর তলদেশের মাটি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয়। তলদেশে স্বাভাবিক মাটি পাওয়া যায়নি। সেতুর পাইলিং কাজ শুরুর পরে সমস্যা দেখা যায়। প্রকৌশলীরা নদীর তলদেশে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় মাটির বদলে নতুন মাটি তৈরি করে পিলার গাঁথার চেষ্টা করে। স্ক্রিন গ্রাউটিং নামের এই পদ্ধতিতেই বসানো হয় পদ্মা সেতু। এ প্রক্রিয়ায় ওপর থেকে পাইপের ছিদ্র দিয়ে নদীর তলদেশে কেমিক্যাল পাঠিয়ে মাটির শক্তিমত্তা বাড়ানো হয়। কেমিক্যালের প্রভাবে তখন তলদেশের সেই মাটি শক্ত রূপ ধারণ করে। একপর্যায়ে সেই মাটি পাইলের লোড বহনে সক্ষম হয়ে ওঠে। তারপর ওই মাটিতে পিলার গেঁথে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে পাইলের সঙ্গে স্টিলের ছোটো ছোটো পাইপ ওয়েল্ডিং করে দেওয়া হয়।

বন্ধুরা পদ্মা সেতু নির্মাণের আরো কিছু চমকপ্রদ তথ্য দেই তোমাদের– মূল সেতু, নদী শাসন ও সংযোগ সড়ক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে ৬ লাখ ৮৬ হাজার টন সিমেন্ট; সেতু ও সংযোগ সড়কে রড লেগেছে ১ লাখ ৮ হাজার টন এবং বালু লেগেছে ৬৫ লাখ ঘনমিটার। এছাড়া ইট লেগেছে ১ কোটি ২০ লাখের বেশি এবং কংক্রিট ব্লক লেগেছে প্রায় ৮০ লাখ যা দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহীত। পদ্মা সেতুর পাথর এসেছে ভারত থেকে স্টিলের মালামাল ও পানি নিরোধক উপকরণ যুক্তরাজ্য, রং যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া থেকে পাইপ ও পলিমার এসেছে। ভূমিকম্প থেকে রক্ষায় চীনের তৈরি (যুক্তরাষ্ট্রে পরিক্ষীত) ৯৬ সেট ফ্রিকশন পেন্ডুলাম বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়েছে যা ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সহনশীল (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ২১শে জুন ২০২২)।

জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছে ১৪৭১ হেক্টর আর মোট নির্মাণ ব্যয় ছিল ৩০,১৯৩.৩৯ কোটি টাকা (দ্যা ডেইলি স্টার, ২৫শে জুন ২০২২)। পদ্মা সেতুর স্থায়ীত্ব কাল ধরা হয়েছে ১০০ বছর। এজন্য সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক পরিচর্যা এবং আশানুরূপ টোল আদায়ে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার (দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ই জুন ২০২২)। পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় পদ্মা সেতু সার্ভিস এরিয়া-১ এ তৈরি করা হবে পদ্মা সেতু জাদুঘর;

যেখানে সেতু তৈরির সময় প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ছবি, ভিডিও, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া পদ্মা সেতুর সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সকলের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবিও এখানে সংরক্ষণ করার কথা রয়েছে। (দৈনিক সংবাদ, ১৫ই জুন ২০২২)

আমরা যদি পদ্মা সেতু নির্মাণের ক্রমধারা দেখি তাহলে দেখা যাবে,

- ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে সরকারি অর্থে প্রি-ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি (সম্ভাব্যতা যাচাই) করা হয়
- ২০০৩-২০০৫ সালে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন করা হয় (জাপান ও জাইকা অনুদানে)
- ২০০৬ সালে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় (সরকারি অর্থে)
- ২০০৯-২০১১ পূর্ণ ক্রয় পরিকল্পনা সম্পন্ন করে মন্সেল লিমিটেড (এডিবি ঋণ এবং সরকারি অর্থ)
- ২০১২ সালের জুন মাসে বিশ্ব ব্যাংক পদ্মা সেতুতে তাদের ঋণ প্রদান বাতিল করে
- ২০১২ সালের জুলাই মাস–আমাদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সময়, আমাদের সক্ষমতা প্রকাশের সময়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা দেশের অর্থেই তৈরি হবে আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু
- ১৭ই জুন ২০১৪ সালে মূল সেতুর জন্য চীনের মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকে নিযুক্ত করা হয়। পাশাপাশি চীনের সিনোহাইড্রো করপোরেশন নদী শাসনের কাজ করে এবং বাংলাদেশের আবদুল মোনেম লিমিটেডকে দুটি সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের চুক্তি দেওয়া হয়
- ১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে স্বপ্নের সেতুর নির্মাণ কাজের সূচনা করেন
- ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পদ্মা সেতুতে পিলারের ওপর বসানো হয় প্রথম স্প্যান। শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারের ওপর ভাসমান ক্রেনের

সাহায্যে এই স্প্যান বসানো হয়

- ১০ই ডিসেম্বর ২০২০–সর্বশেষ স্প্যানটি বসানো হয়
- ৪ঠা জুন থেকে ১০ই জুন ২০২২ পর্যন্ত ধাপে ধাপে সেতুর ৪১৫টি বাতির পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। ১৪ই জুন একযোগে সবগুলো বাতি জ্বালানো হয়
- ২৫শে জুন ২০২২-অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্‌বোধন করেন স্বপ্নের পদ্মা সেতু- যা আমাদের গর্বের, আমাদের সক্ষমতার এবং আমাদের সাহসী অগ্রযাত্রার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
- ২৬শে জুন ২০২২ থেকে সেতুটি খুলে দেওয়া হয় সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য।

মাত্র ৮ মিনিটে এই সেতু দিয়ে বিশাল পদ্মা পার হওয়া যায়। এই সেতুটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে। ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কি.মি. (১৭,০০০বর্গ মাইল) বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চল জুড়ে ৩ কোটিরও অধিকজন মানুষ উপকৃত হবে। সিনিয়র তথ্য অফিসার পরীক্ষিৎ চৌধুরীর ভাষায়, পদ্মা সেতু যেন মেঘের আড়ালে সূর্যের হাসি। কেননা পদ্মার দুই পাড়ে গড়ে উঠবে অলিম্পিক ভিলেজ, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি, হাইটেক পার্ক, আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, তাঁত পল্লি ও নানাবিধ পর্যটন কেন্দ্র (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯শে জুন ২০২২)। ফলে প্রকল্পটি দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সেতুটিতে ভবিষ্যতে রেল, ৭৫০ মিলিমিটার ব্যাসের গ্যাস লাইন, বৈদ্যুতিক লাইন এবং ১৫০ মিলিমিটার ব্যাসের ফাইবার অপটিক কেবল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সেতুটি নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের জিডিপি ১.৭ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এছাড়া আশা করা হচ্ছে নির্মাণ খাতে ২৯%, কৃষি খাতে ৯.৫% এবং পরিবহণ ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ৮% প্রবৃদ্ধি হবে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলে ১% ও জাতীয়ভাবে ০.৮% দারিদ্র্য কমার আশা করা হচ্ছে (দ্যা ডেইলি স্টার, ২৫শে জুন ২০২২)। পদ্মা ও কালনা সেতু চালু হলে আন্তর্জাতিক রুটে এশিয়ান হাইওয়েতে (যা এ এইচ-১ নামে পরিচিত) যুক্ত হতে পারবে বাংলাদেশ। রুটটি জাপান থেকে চালু হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক হয়ে বুলগেরিয়া সীমান্তে গিয়ে শেষ হবে। (দৈনিক সংবাদ, ২২শে জুন ২০২২)

অবশেষে বলতে চাই ২৫শে জুন বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দিন, যা বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন মনে রাখবে। সেদিন পদ্মা পাড়ে ধ্বনিত হয়েছিল জয়ধ্বনি, পদ্মার ঢেউয়ের সাথে রণিত হয়েছে মুহুর্মুহু স্লোগান- জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। সেদিন পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছে বাংলাদেশ অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ায় না, বাঙালি জাতি বীরের জাতি। কেননা বাংলার মানুষের আকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য, অবিচল এবং সাহসী নেতৃত্বে আমরা জয় করেছি অসম্ভবকে। তাই তো প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'জনগণ পাশে দাঁড়িয়েছেন, সমর্থন দিয়েছেন বলেই পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে'।

আর সেই সাথে স্বপ্নের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে রুপালি পদ্মা, আমরা আশা করি সেই রুপালি আলোয় দূরীভূত হবে বাংলার দারিদ্র্য, আর আমরা গড়তে পারব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। আসুন আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশ গঠনে অবদান রাখি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নযাত্রার সহযাত্রী হই। ■

পরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ঢাকা

জিআই পণ্য ইলিশ

মোহাম্মদ জারিফ

জিআই হলো ভৌগলিক নির্দেশক চিহ্ন যা কোনো পণ্যের একটি নির্দিষ্ট উৎপত্তি স্থলের কারণে এর খ্যাতি বা গুণাবলি নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত জিআইতে উৎপত্তিস্থলের নাম (শহর, অঞ্চল বা দেশ) অন্তর্ভুক্ত থাকে। জিআই (GI) এর পূর্ণরূপ হলো (Geographical indication) ভৌগলিক নির্দেশক। WIPO (world intellectual property organization) হলো জিআই পণ্যের স্বীকৃতি দানকারী প্রতিষ্ঠান।

কোনো নির্দিষ্ট স্থানের পণ্য খুব নামকরা হলে এবং সেই নামের ওপর বিশ্বাস করেই পণ্যটি কেনা ও ব্যবহার করার গুরুত্ব দিতেই এই জিআই সনদ দেওয়া হয়। প্রতিটি পণ্যের সঙ্গে সে স্থানের নাম যুক্ত করা হয়।

যেমন: ঢাকাই জামদানি এক সময় শুধু ঢাকার কারিগররাই উৎপাদন করতে পারতেন। আর ঢাকার আবহাওয়াও এ জামদানি তৈরির জন্য উপযোগী ছিল। ফলে যুগের পর যুগ তারা এ জামদানি তৈরি করে এসেছে। যা পৃথিবী জুড়ে স্বীকৃত।

বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো জিআই পণ্য হিসেবে ২০১৬ সালে স্বীকৃতি পেয়েছিল জামদানি। এরপর ২০১৭ সালে ইলিশ, ২০১৯ সালে খিরসাপাতি আম, ২০২০ সালে ঢাকাই মসলিন এবং ২০২১ সালে রাজশাহী সিল্ক, রংপুরের শতরঞ্জি, কালিজিরা চাল, দিনাজপুরের কাটারিভোগ চাল এবং নেত্রকোনার সাদামাটি মোট ৫টি পণ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জিআই পণ্য সর্বমোট ১০টি। যা এখন থেকে বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পাবে।

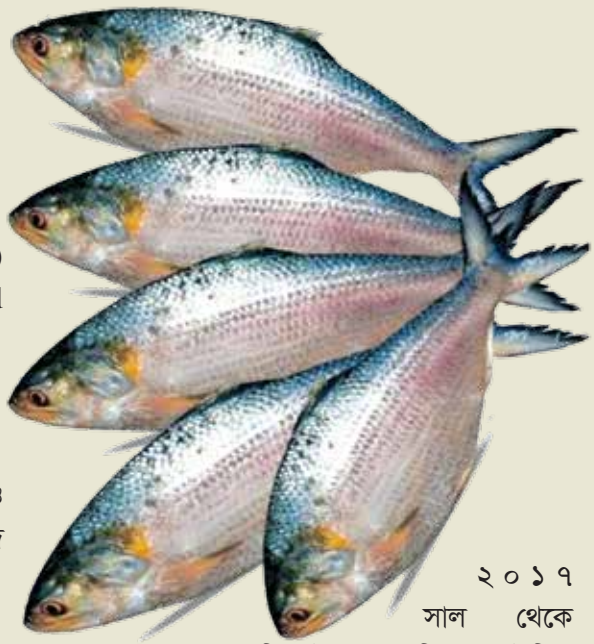

২০১৭ সাল থেকে জিআই পণ্য হিসেবে ইলিশ বাংলাদেশের নিজস্ব পণ্য হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পায়। এর ফলে অন্যান্য আরোও ৭০টি পণ্য জিআই পণ্য হিসেব স্বীকৃতি পাওয়ার পথ সুগম হলো। ওয়ার্ল্ড ফিশের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিশ্বের মোট ইলিশের ৬৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। ভারতে ১৫ শতাংশ, মিয়ানমারে ১০ শতাংশ, আরব সাগর তীরবর্তী দেশগুলো এবং প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর তীরবর্তী দেশগুলোতে বাকি ইলিশ ধরা পড়ে। ইলিশ আছে বিশ্বের এমন ১১টি দেশের মধ্যে ১০টিতেই ইলিশের উৎপাদন কমছে। একমাত্র বাংলাদেশেই ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে।

দেশের পদ্মা-মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদ-নদী ও উপকূলীয় এলাকায় পাওয়া যায় ইলিশ। এটি লম্বায় সর্বোচ্চ ৬৩ সেন্টিমিটার ও ওজনে তিন কেজি ৩০০ গ্রাম হতে পারে। তবে সচরাচর ২ কেজি ওজনে

পৌঁছানোর আগে জেলেদের জালে ধরা পড়ে ইলিশ।

বর্তমানে দেশের প্রায় ১০০ নদ-নদীতে পাওয়া যাচ্ছে ইলিশ। এর প্রধান আহরণ এলাকা হচ্ছে- মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল, তেঁতুলিয়া, কালাবদর বা আড়িয়াল খাঁ, ধর্মগঞ্জ, নয়াভাঙানি, বিষখালি, পায়রা, রূপসা, শিবসা, পশুর, কচা, লতা, লোহাদিয়া, আন্ধারমানিকসহ অনেক মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলে। সারা বছরই ইলিশ ধরা পড়ে। নদীর নাব্যতা হ্রাস, পরিবেশ বিপর্যয়, জাটকা নিধন ও ডিমওয়ালা ইলিশ বেশি মাত্রায় আহরণে গত কয়েক দশকে ইলিশের উৎপাদন কমে গিয়েছিল। ইলিশ সংরক্ষণে পদ্মায় ইলিশের অভয়াশ্রম করায় আগের চেয়ে পরিমাণ বেড়েছে। ইলিশ মাছ সারা বছরই প্রজনন করে তবে বেশি করে অক্টোবর মাসের পূর্ণিমায়। এসময় ৬০-৭০ শতাংশ ইলিশ পরিপক্ক ও ডিম ছাড়ার উপযোগী হয়। সাধারণত এক বছর বয়সের মাছ পরিপক্ক হয়। আবহাওয়ার তারতম্যে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও পরিপক্ক হতে পারে।

দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ মাছের অবদান প্রায় ১০ শতাংশ। এর বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩.৮৭ লাখ মেট্রিক টন (২০১৪-২০১৫); যার বাজার মূল্য ১৫ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। জিডিপিতে ইলিশের অবদান প্রায় ১%। কর্মসংস্থানে ইলিশের ভূমিকা রয়েছে ব্যাপক। দেশের ৪০ জেলার প্রায় ১৪৫ উপজেলার ১৫০০টি ইউনিয়নের সাড়ে ৪ লাখ জেলে ইলিশ মাছ ধরে। এরমধ্যে গড়ে ৩২% সার্বক্ষণিক ও বাকি ৬৮% খণ্ডকালীনভাবে জড়িত। এছাড়া বিপণন, পরিবহণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানি ও জাল-নৌকা তৈরিতে সার্বিকভাবে ২০-২৫ লাখ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাভাবে জড়িত।

১৮২২ সাল থেকে ইলিশ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্যে এ মাছের ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় মাছ ইলিশ দেশের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। প্রাচীন বাংলা, সংস্কৃত সাহিত্য ও লোকজ সংস্কৃতিতে ইলিশের স্বাদ, খাওয়ার পদ্ধতি এবং সংরক্ষণের বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ইলশে গুড়ি' কবিতা এখনও আমাদের আলোড়িত করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসেও প্রমত্ত পদ্মায় এক সময় ইলিশ মাছে ভরপুর থাকার কথা রয়েছে। প্রাচীনকালের লোকজনের বিশ্বাস ছিল, আশ্বিন-কার্তিক মাসের দুর্গাপূজার দশম দিন থেকে মাঘ-ফাল্গুনের স্বরস্বতী পূজার দিন পর্যন্ত ইলিশ ধরা ও খাওয়া বন্ধ রাখা হলে এ মাছ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।■

প্রাবন্ধিক

আষাঢ় এল

মনিরা ইউসুফ

কখনো আলো কখনো কালো
মেঘের খেলা চলছে ভালো
বৃষ্টিতে ভিজে পাতারা
ধোয়া হয়েছে সারা
মনের মাঝে সুর বাজে
ফুলের গন্ধে বাগান সাজে
বৃষ্টির ফোঁটা আছে ঘাসে
তাই দেখে মন মোর হাসে

৮ম শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

গল্প

এলিয়েন বন্ধু

আখতারুল ইসলাম

নিশাত তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। তার পছন্দের একটি কাজ ছবি আঁকা। পড়ালেখা শেষ করে একটা না একটা ছবি সে আঁকবেই। স্কুলের ড্রইং স্যার পাহাড়িয়া এলাকার ছবি এঁকে নিয়ে যেতে বলেছে। আজ শুক্রবার ছুটির দিন হওয়ায় মনোযোগ দিয়ে ছবি আঁকতে বসে নিশাত।

একটা ছবি দাঁড় করাতে চেষ্টা করে, পাহাড় ও গাছঘেরা বন সাথে নীলাকাশ, লাল সূর্য, সাদা কালো মেঘ তার পাশেই একটা ঝরনা। পাহাড় ও মেঘ ঘেষে ঝরনার উপরে এক ঝাঁক পাখি। সুন্দর একটা ছবি হয়ে উঠতেই ঝামেলা বাধলো রং করতে গিয়ে, লাল নীল সবুজ হলুদ রংগুলো রঙের প্লেটে নিয়ে জল মেশাতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে হাত ফসকে জলরং পরে কার্টিস পেপারে আঁকা ছবি অন্য রকম হয়ে গেল। পাহাড়ের রঙের সাথে আকাশের রং মিশে ছবিটা হয়ে ওঠে মহাকাশে গ্রহ নক্ষত্র সমৃদ্ধ ছবি। তাতে একটা এলিয়েনের মতো প্রাণী উড়ছে। প্রাণীটি

হঠাৎ থেমে এক দৃষ্টিতে নিশাতের দিকে তাকিয়ে থাকে।
নিশাত অবাক হয়ে দেখে। কার্টুন বা এনিমেশন ছবির মতো প্রাণীটি বলছে কী ছবি আঁকলে?
নিশাত চোখ কচলাতে কচলাতে ভাবছে স্বপ্ন দেখছে নাকি। না, স্বপ্ন না বাস্তব।
নিশাত বলল, কে তুমি?
প্রাণীটি বলল, আমি এলিয়েন।
এলিয়েন!
হ্যাঁ, অনেক দূরে আকাশের ওপারে আমাদের বাড়ি।
তুমি আমার ছবিতে কীভাবে এলে?
জানালায় বসে বসে তোমার ছবি আঁকা দেখছিলাম, মন চাইল আর হুট করে তোমার ছবির মধ্যে ঢুকে গেলাম। ভেবেছিলাম তুমি ভয় পাবে। কিন্তু তুমি তো খুব সাহসি ভয় তো পেলেই না বরং জিজ্ঞেস করছ আমি কে?
নিশাত বলল, এখন তো আমার ভয় করছে।
কিসের ভয়?
টিভিতে ভূত, ডাইনি অনেক কিছু দেখি। তুমিও দেখতে তাদের মতো?
সত্যি কি তাই?
হ্যাঁ
আমার গঠন আকৃতি তেমন হলেও তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমার বন্ধু হতে এসেছি।
এলিয়েন কারো বন্ধু হয়?
হয় তো! দেখো না আমি বন্ধু হতে এসেছি। আর আমার ছবি আঁকাতে তোমার আঁকাটা অন্য রকম হয়ে ওঠে। বন্ধুকে কি কেউ ভয় পায়?
সত্যি বন্ধু!
এলিয়েন বলল, হ্যাঁ। সত্যি বন্ধু । তোমার স্কুলের সাদমান, সাব্বির, রিয়া, আসিফ, জুঁই এদের মতো একজন বন্ধু!
নিশাত বলল, তুমি আমার বন্ধুদের নাম জানলে কী করে?
জানি জানি সব জানি। বা রে তোমার বন্ধু হব আর তোমার অন্য বন্ধুদের নাম জানব না তা কেমন করে হয়।
এলিয়েন বন্ধু!
হ্যাঁ, এলিয়েন বন্ধু।
নিশাত বলল, দেখো এলিয়েন আমার কিন্তু এখনো ভয় করছে।
এলিয়েন বলল, এই আমাকে ছুঁয়ে দেখ। ভয় কেটে যাবে।
নিশাত আস্তে আস্তে হাত বাড়াতে গিয়েও ছুঁই না।
এলিয়েন বলল, ভয় পাচ্ছো কেন? যারা ঠিকমতো পড়াশোনা করে তাদের ভয় পেতে নেই?
ভয় পেতে নেই কেন? নিশাতের প্রশ্ন।
কারণ পড়ালেখা মানুষকে জ্ঞানী করে বুদ্ধিমান বানায়, আর্দশবান বানায়। আর বুদ্ধিমান মানুষের ভয় থাকতে নেই।
আচ্ছা বলে এবার এলিয়েনকে ছুঁয়ে দেখে নিশাত, হ্যান্ডশেক করে, হঠাৎ যেন এক ধরণের অনুভূতি ফিল করে নিশাত। হাত ছেড়ে দেয়।
এলিয়েন বলল, ভয় নেই বন্ধু, আমি অন্য গ্রহের প্রাণী তো তাই তোমার অন্য রকম একটা অনুভূতি হবে এটা স্বাভাবিক। নিশাত ভাবছে সত্যি তো এলিয়েন আমার মনের কথা ও বুঝেছে।
হঠাৎ নিশাতের মায়ের ডাক। নিশাত, নিশাত এই নিশাত কার সাথে তুমি কথা বলছ?
না, মা। কারো সাথে না ।
নিশাত এলিয়েনকে বলল, এখন কী হবে?
এলিয়েন বলল, কিছুই হবে না। তুমি চোখ বন্ধ করো, ঠিক দুই সেকেন্ড পরে চোখ মেলবে।
নিশাত দুই সেকেন্ড পরে চোখ খোলে দেখে এলিয়েন নেই। চতুর্দিকে খুঁজেও পায় না। মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ঠিক সেই মূহুর্তে নিশাতের মা নিশাতের রুমে ঢুকে।
মা বলল, তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?
নিশাত বলল, কই না কারো সাথে না।
মা বলল, ছবি আঁকা শেষ?
হ্যাঁ মা, দেখো না রং পড়ে ছবিটা কেমন বিশ্রি হয়ে গেছে।
মা বলল, না তো খুবই সুন্দর হয়েছে। যেন অন্য গ্রহের ছবি।
নিশাত বলল, স্যার বকা দিলে।
মা বলল, স্যার বকা দিবে না, তোমার ছবি আনকমন, চমৎকার। মা চলে গেলে নিশাত ভাবে কখন আবার তার এলিয়েন বন্ধু আসবে। ■

গল্পকার

পাতলাদার কাক কারখানা

মনি হায়দার

জুরাইনের রেল লাইনের উপর আমরা আড্ডা দিচ্ছিলাম। আমাদের সঙ্গে পাতলাদাও আছে। কিন্তু সেই সকাল থেকে তার মুখ ভার। ভার মানে কি– ভয়ানক ভার। অনেক চেষ্টা করেও আমরা তার গোমরা মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি। শেষে আমরাই আড্ডা দিচ্ছি। কিন্তু আড্ডা জমছে না। হঠাৎ ঝড়ো কাকের মতো এসে উপস্থিত জগলু। এসেই পিঠ ঝাড়তে ঝাড়তে বলল– দুষ্টু কাক ময়লা ফেলেছে আমার শরীরে।

এতক্ষণে আমাদের পাতলাদা নড়েচড়ে বসে–এ্যাই জগলু আর কখনও কাকদের গালমন্দ করবি না।

কেন? কাক যে আমার জামা নষ্ট করল! জগলুর গলা ভয়ানক চড়া।

পাতলাদার মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি–আট বছরের পুরোনো শার্ট-চার চারটে তালি, তাতে আবার এক কেজি ময়লা। সেই শার্টে কাক না হয়– আমার

জামার চেয়ে তোমার কাছে কাক বড়ো হলো? আহত গলা জগলুর। কাক কী হয় তোমার? খালাত ভাই না মামাত ভাই?

কাক আমার কী হয়? পাতলাদার মুখে আগের উদাস হাসি ফিরে এসেছে। আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। কাকের সঙ্গে পাতলাদার কি কোনো চুক্তি হয়েছে? আমাদের ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে পাতলাদা বললে– কাক আমার বন্ধু।

কাক তোমার বন্ধু?

ঘাড় নাড়ে পাতলাদা, হ্যাঁ।

চটে যায় জগলু– কাক তোমার বন্ধু! আর আমি মানে আমরা তোমার শত্রু?

তা হতে যাবে কেন? তোরা আমার শাগরেদ আর কাক হলো গিয়ে আমার বন্ধু।

কি রকম?

পালটা প্রশ্ন করে পাতলাদা– কি রকম? পাতলাদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে দুহাত উপরে তুলে নাচতে থাকে। আমরা অবাক। নাচতে নাচতে পাতলাদা সুরে সুরে গাইছে–ইউরেকা ইউরেকা...ই...উ...রে ...কা... । আমরা হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না। কেবল পাতলাদাকে দেখছি, তার নাচ দেখছি। হঠাৎ নাচ থামিয়ে পাতলাদা বলল– কাল সকালে বাসায় আসিস। জরুরি মিটিং আছে।

ব্যাপারটা অনেকদিন আমার মাথায় খেলছিল।

পরের দিন সকালে পাতলাদার বাসায় আমরা হাজির হই। আমাদের ভরপেট নাশতা খাওয়ালো। খাওয়া দাওয়া সেরে পাতলাদার রুমে বসেছি। পাতলাদা তার হাতলভাঙা চেয়ারে বসে পান চিবুতে চিবুতে কথা বলছে– কিন্তু গতকাল জগলুর কাক সম্পর্কে বাজে মন্তব্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যাপারটার একটা জিওগ্রাফি আমার মাথায় আসে। তারপর বাসায় এসে গবেষণা করে আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি।

কি সিদ্ধান্তে এসেছ? প্রশ্ন করে ঈগলু।

আমি একটা কাক কারখানা তৈরি করব।

কান পাতে ইমরান– কি বললে? কালা সার কারখানা বানাবে?

পাতলাদা রাগে দাঁত কিড়মিড় করে– হাদারাম গাধা কোথাকার! কাক কারখানা বানাব। কাক । মানে কা... কা... করে ডাকে যে পাখি। বুঝেছিস?

বুঝেছি মানে! এত ভালোভাবে বুঝেছি যে নড়াচড়া করতে ভয় পাচ্ছি আমরা। এতদিন ইতিহাস, ভূগোলে শুনে এসেছি মানুষ ছাগল পালে, গরু পালে, মাছ চাষ করে। অনেকে আবার কুমিরও নাকি পালে। কিন্তু কাক পালে তা তো শুনিনি। আর কাক কি একটা পালবার জিনিস হলো?

আমাদের ভাবান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পাতলাদা জিজ্ঞেস করে–আমার প্রস্তাবটা তোদের ভালো লাগেনি?

আমরা সম্মিলিতভাবে না বোধক মাথা নাড়ি। পাতলাদা বুকের তিন মাইল গহীন থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে–তোদের জন্য আমার ভয়ানক দুঃখ হয়। তোদের মতো গো মূর্খদের সঙ্গে আমাকে থাকতে হচ্ছে। আবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ– শোন, কাক মানুষের পরম বন্ধু। রাস্তাঘাটে যত ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকে কে পরিষ্কার করে? কাক। সকালে ঘুম থেকে ডেকে তোলে কে? কাক। জগতে সবচেয়ে একতাবদ্ধ প্রাণী কোনটা? কাক।

তোমারে কেডায় কইল কাক একতাবদ্ধ প্রাণী? বরিশালের সাগরকে আর আটকে রাখা গেল না।

শহরের রাস্তায় কোনো কাক মারা গেলে দেখিছিস কত কাক এসে জড়ো হয়? কিংবা একটা গাছে কাকের বাসা থাকলে সেই গাছে উঠতে পারবি? শত শত কাক এসে তোকে খেয়ে ফেলবে। এমন একতাবদ্ধ প্রাণী আর দেখেছিস?

এইডা তুমি হাচাই কইছো– সাগর সায় দেয়।

তারপর মৃত কাকের কাছে এসে জীবিত কাকেরা কি বলে– জানিস?

আমরা কোরাসে বলি– না।

পাতলাদার লম্বাটে মুখে গোলাকার হাসি–সে আমি জানি। মৃত কাককে জীবিত কাকেরা কবিতা পড়ে শোনায়। ওরা বিদেহী আত্মার জন্য গান গায়। বলে– বন্ধু পরজগতে আমাদের ভুলে যেও না। সময় হলে ও আমরাও আসবো।

তুমি এসব জানলে কি করে? আমি জানতে চাই।

পাতলাদার মুখে রহস্যময় হাসি– আমি জানি। আমাকে অনেক কিছুই জানতে হয়। যাগগে– আমার কাক কারখানায় কে কে চাকরি করবি? হাত তোল–

কাক কারখানায় চাকরি! কেউ ভরসা করতে পারলাম না– সুতরাং আমরা কেউ হাত তুললাম না। আমাদের চরম নির্বুদ্ধিতে পাতলাদার ঠোঁটে চিকন হাসি। ভাঙা চেয়ার ছেড়ে রুমের মধ্যে পায়চারি করতে করতে পাতলাদা করুণ কণ্ঠে বলে– তোরা আমার আইডিয়াটাই বুঝতে পারিসনি। জীবনে আমি যা করেছি অন্যের থেকে একেবারে আলাদা কিছু করেছি। অন্যরা গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, হাঁস ও কুমির ইত্যাদি পালে। আমি পাতলা খান ওসব করতে যাবো কেন? আমি তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কাক পালব। শুনে লোকের চোখ উলটে যাবে। অনেকে পিছনে বদনাম করবে। কিন্তু যখন কাক বিক্রি করে কাড়ি কাড়ি টাকা আয় করব– তখন? আপন মনে মাথা নাড়ায় পাতলা– তখন সবাই আমার পিছনে ছুটবে। দুনিয়ার নানা জায়গা থেকে লোক আসবে আমার কাছে কাক পালন প্রশিক্ষণ নিতে। তখন তো ডলার আসবে। আমার সঙ্গে যে যে থাকবে তাদের মাঝেমধ্যে বিদেশে পাঠাব। আরে সব প্রশিক্ষণ কি আমি দিতে পারব? একা মানুষ কতদিক সামলাব? কাক নিয়ে দুনিয়ায় গবেষণা শুরু হয়ে যাবে। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসবে জানতে কেন আমি এই কাক কারখানা খুললাম? আর আমার কাক কারখানায় যারা চাকরি করবে তাদের বেতন যে কত টাকা হবে চিন্তাও করতে পারবি না। একবার আমার কাক কারখানায় ঢুকলে লেখাপড়ার দরকারই হবে না। যা লেখাপড়া করেছিস তাই যথেষ্ট।

কথা বলতে বলতে পাতলাদা আমাদের দিকে তাকিয়েই দেখতে পায়– আমাদের সবার হাত উপরে তোলা। মুখে তার বিজয়ের হাসি। হালকা গোঁফে তা দিতে দিতে হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে পাতলাদা।

তোরা আমার কাক কারখানায় চাকরি না করলে আমি কাক কারখানাই তৈরি করতাম না। তোরাই তো আমার আশা–আমার ভরসা। এখন আসল কাজ কাক কালেকশন করা–

কিন্তু কাক কীভাবে কালেকশন করব? জানতে চায় ঈগলু।

কাক ধরা একটা কঠিন কাজ– মন্তব্য সাগরের।

হ্যাঁ– কাক ধরা কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের অসাধ্য কি কিছু আছে? যদি সাগরের তলদেশে গিয়ে মুক্তো মানিক খুঁজে আনতে পারে– তবে আমরা কেন কাক ধরতে পারব না! লোকে শুনলে আমাদের নিন্দে করবে না?

ঠিক বলেছ– ঢোলে বাড়ি দেয় ইমরান।

আচ্ছা– বিদেশ থেকে কাক ধরা বিশেষজ্ঞ আমদানি করা যায় না? প্রস্তাব দেয় জগলু।

ওর দিকে দাঁত কটমট করে তাকায় পাতলাদা– তোকে এক চড়ে চরজব্বলপুরে পাঠিয়ে দেয়া দরকার। নিজেদের কাজ নিজেরা করব– এসবের মধ্যে আবার বিদেশি কেন?

না, আজকাল দেখি, দেশের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে অমুক তমুক সব কাজে বিদেশিদের ভাড়া করে আনা হয়– তাই বলছিলাম আর কি! নিজের পক্ষে সাফাই গায় জগলু। আজকাল দেখছি জগলু মিয়ার সাহস বেড়ে গেছে।

যারা বিদেশিদের ভাড়া করে এনে কাজ করায় তারা দেশের শত্রু। কিন্তু আমরাত দেশকে ভালোবাসি। দেশে, পৃথিবীতে প্রথম কাক কারখানা করে কাক উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করব। আমাদের রপ্তানিখাতে নতুন একটা আইটেম যুক্ত হবে। চাইলে সরকার খুশি হয়ে

আমাদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার টুরস্কার দিতে পারে– গভীর আশা ছড়িয়ে থামে পাতলাদা।

এতক্ষণে পাতলাদার কথায় একটা আশার ঝিলিক দেখতে পেলাম। সত্যিই তো দুনিয়ার কোথাও কাক কারখানা নেই। প্রথম হবে বাংলাদেশ। দেশ-বিদেশে আমাদের কাক কারখানার নাম ছড়িয়ে পড়বে। দলে দলে লোক লস্কর আসবে। ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে–পাতলাদা? আমি একটা কথা বলি?

বল।

আমরা বুড়া কাক না ধরে যদি ছাও কাক ধরি–আমার কথা শেষ হতে পারে না, পাতলাদা উজ্জ্বল চোখে মুখে আবার হাতলভাঙা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়– নারে, আমাদের ভোম্বলের মাথায় কেবল খাঁটি গোবর না। মাঝে মধ্যে মচৎকার বুদ্ধি-টুদ্ধিও দেয়।

পাতলাদা! শব্দটা মচৎকার না– চমৎকার– জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করে ঈগলু।

সঙ্গে সঙ্গে পাতলাদার বখতিয়ার খিলজি মার্কা হাতের চাপড় পড়ে ঈগলুর চ্যাপটা পিঠের উপর, ব্যথায় কুঁকড়ে যায় মিস্টার ঈগলু–আমাকে জ্ঞান দিতে আসো! শোন, চমৎকারের আবেদন যখন একশা গুণ বেড়ে যায় তখনই আমি মচৎকার শব্দ ব্যবহার করি। মনে থাকে যেন।

পিঠ ডলতে ডলতে ঘাড় নাড়ে ঈগলু–থাকবে। চিরকাল মনে থাকবে।

তাহলে কথা হলো কাল সকালে আমরা বেড়িয়ে পড়ব–অনেকটা ঘোষণার মতো করে বলে পাতলাদা।

কোথায় বেরিয়ে পড়ব? জিজ্ঞেস করে ইমরান।

ছাও কাক খুঁজতে।

কোন এলাকায় যাব?

কোন এলাকায় মানে? সব এলাকায়– এই জুরাইন থেকে আরম্ভ করে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সব এলাকা চষে বেড়াব। যেখানে কাকের বাসা পাব– সেই বাসার ছাও পেড়ে আনব। কত কাজ! সেই ছাও কাকদের লেখাপড়া, নাচ, গান, ক্রিকেট শেখানো। যা তোরা বাসায় যা–কাল খুব সকালে চলে আসবি।

পরের দিন পাতলাদার সঙ্গে আমরা বাংলা বিহার উড়িষ্যা চষে বেড়িয়ে কাকের ছাও খুঁজতে লাগলাম। সকাল পার হয়ে দুপুর। খিদে পেট চো চো করছে। কিচ্ছুটি করার উপায় নেই। পাতলাদা রেগে মহা আগুন। এখন পর্যন্ত একটা কাকের বাসা আমরা আবিষ্কার করতে পারি নাই। কাক কেন বাসা বানায় নাই– তার সব দায় দায়িত্ব বুঝি আমাদের। একেই বুঝি ফাটা কপাল বলে। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে জগলু– পাতলাদা! ওই দেখা যায় কাকের বাসা–

আমরা সত্যি তাকিয়ে দেখি একটা নাম না জানা এক হাত মোটা গাছের মগডালে কাকের বাসা। এবং সেখানে কয়েকটি ছাও কাক নড়াচড়া করছে। পাতলাদার কাক কালো মুখে হাসি। বাইনোকুলার লাগিয়ে কাকের ছাও পর্যবেক্ষণ করে পাতলাদার–পরিশ্রম সার্থক হতে চলেছে। একটা বাসায় দশ বারোটা কাকের ছাও– তোরা থাক। প্রথম কাকের ছাও আমিই পেড়ে আনি। সঙ্গে আনা একটা বস্তা নিয়ে পাতলাদা গাছে উঠতে লাগল। আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি। গাছের মাঝামাঝি গেছে মাত্র– কোত্থেকে মুহূর্তের মধ্যে কয়েকশ কাক জড়ো হয়ে পাতলাদার উপর হামলে পড়ল। আমি তার স্বরে চিৎকার করে বলছি– পাতলাদা নামো, তাড়াতাড়ি নামো–

মুখের কথা শেষ হতে পারে না–পাতলাদাকে হাত পা ছেড়ে বিদুৎ গতিতে নিচে নেমে আসতে দেখলাম। আমরা চোখ বুঝে দাঁড়িয়ে আছি– একটি শব্দের আশায়, নাম না জানা গাছটির নিচ দিয়ে প্রবাহমান খালের স্রোতে ঝপাৎ শব্দে কখন পতিত হবে প্রিয় পাতলাদা! ■

কথাসাহিত্যিক

কবিতাগুচ্ছ

প্রিয় বাংলাদেশ

এম ইব্রাহীম মিজি

কোন দেশেতে সোনার ফসল
সবুজ মাঠে হাসে,
কোন দেশেতে বিলের মাঝে
শাপলা শালুক ভাসে।
কোন দেশেতে মাঝি মাল্লা
গায়রে ভাটির গান,
কোন দেশেরই শ্যামল শোভায়
জুড়ায় সবার প্রাণ।
কোন দেশেতে যায়রে বধূ
কলসি নিয়ে ঘাটে,
কোন দেশেতে নবীন সেনা
মগ্ন সদায় পাঠে।
কোন দেশেতে পাখির কুজন
আকুল করে মন,
কোন দেশেতে ছড়িয়ে আছে
মুক্তো মানিক ধন।
কোন দেশেরই রূপে পাগল
আউল বাউল কবি,
কোন দেশেতে শিল্পী আঁকেন
শ্যামল গাঁয়ের ছবি।
সেই যে আমার জন্মভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ,
বন বনানীর ছায়ায় ঘেরা
রূপের যে নেই শেষ।

স্মৃতির বার্তা

প্রজীৎ ঘোষ

হে আষাঢ়ের ঝিরিঝিরি মেঘ!
উতল হাওয়ার মিষ্টি আবেগ
তুমি আমার ভালোবাসার
একটি নতুন ফুল;
বৃষ্টি পরশ পেলেই আমার
যায় ভেঙে সব ভুল।
রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি পড়ে
ঘরের চালে, কুঁড়েঘরে
আহ্ কী সুন্দর! রূপ মনোহর
কুমার নদীর সবুজ চরে।
এই আষাঢ়ের বাদল ধারায়
দিয়াশলাই আগুন হারায়
সূর্য মামা মুচকি হেসে
মাঝে মাঝে মুখটি বাড়ায়।
এই ঘন ঘোর কুয়াশা যেন
বইছে চারিদিকে;
সব হৃদয়ে স্মৃতির বার্তা
বর্ষা রাখে লিখে।

জীবন

মাসুমা জাহান

জীবন কেমন?
হাসি এবং কান্না।
মহৎ জীবন
বেশি কিছু চান না।
কষ্ট করে বেঁচে থাকার জন্য
কষ্ট ভুলে বেঁচে থাকার জন্য
সবার জন্য শুধু সবার জন্য
জীবনটাকে করতে পারলে ব্যয়
জীবন হবে মহৎ, হবে জীবন ধন্য।
সবার জন্য জীবন সবার জন্য।

ডাক্তার মাইকেল

জাকারিয়া আব্দুল্লাহ্

আমাদের গাঁয়ে আছে
এক বুড়ো ডাক্তার,
চোখ দুটি ছোটো ছোটো
ইয়া বড়ো নাক তার।
চুল তার যেন পাট
দাঁত নেই একটাও,
পানি দিয়ে গুলে খায়
মধু, দই, কেকটাও।
ঘাড়ে ব্যাগ নিয়ে হাঁটে
হাতে ধরে সাইকেল,
নাম তার ভিনদেশি
'ডাক্তার মাইকেল।'
কত ভালো ডাক্তার?
সেই কথা বাদ দিন,
বিপদ-আপদে তারে
পাশে পাই রাতদিন।
বাত হতে কলেরায়
ভুগে যেই কল দেয়,
ছুটে এসে মুখে তার
প্যারাসিটামল দেয়।

ছোট্টবেলার স্মৃতি

ইমরান পরশ

ছোট্টবেলা ভালোই ছিলাম হলাম ধীরে বড়ো
বুকের ভেতর দুঃখ এখন হয় যে জড়োসড়ো।
সারা বিকেল করলে খেলা করত না কেউ মানা
এখন শুধু স্বাধীনতায় দিচ্ছে সবাই হানা।
উতলা মন রয়না ঘরে শোনে না তো বারণ
খুনসুটিতেই দুঃখ লাগে শুধু যে অকারণ।
সারাটাদিন উধাও হয়ে ফিরলে সন্ধ্যে বেলা
ধাওয়া দিত মা যে তখন নিয়ে বাঁশের চেলা।
ছিবুড়ি আর গোল্লাছুটের হারিয়ে গেছে দিন
সবই আঁকা স্মৃতির পটে হয়নি আজও লীন।
আদর করে গায়না তো মা ঘুম পাড়ানি গান
নাটাই বাঁধা ঘুড়ি আজও দেয় হৃদয়ে টান।
ব্যস্ত সময় আজ কাটে না যন্ত্র চাকার ঘরে
ভেলায় চড়ার সাথিরা যে কোথায় আছে পড়ে।
ছোট্টবেলার দিনগুলো যে আর পাব না ফিরে
স্মৃতি শুধু থাকবে পড়ে জীবন নদী তীরে।

শেয়াল মামা

ইমরান খান রাজ

আম খেতে ভারি মজা
তেঁতুল খেতে টক,
শেয়াল মামা মুরগি দেখে
হাসে খকখক।
পেয়ারা খেতে খুব মিষ্টি
মরিচ খেতে ঝাল,
সিংহ রাজার দৌড় খেয়ে
শেয়ালের মুখ লাল।

এসডিজি অর্জনে জেন্ডার বাজেটের গুরুত্ব

হাছিনা আক্তার

জেন্ডার বাজেট মানে হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে যে তফাতগুলো রয়েছে, তা চিহ্নিত করা। কিন্তু নারীরা পিছিয়ে আছে বলে নারীর বিষয়টি বেশি আলোচিত হয়। জেন্ডার বাজেট কিন্তু নারীর জন্য আলাদা কোনো বাজেট নয়, বরং এটি একটি পদ্ধতি। যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশের সাহায্যে জাতীয় বাজেটের জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা যায়। জেন্ডার বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার সংবেদনশীলতা চিহ্নিত করে বাজেটে সম্পদের যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা বৃদ্ধি বা অসমতা হ্রাস করা। জেন্ডার বাজেট শুধু টাকার হিসাব নয়। এ বাজেটের মূল উদ্দেশ্য জেন্ডার বা সমতার বিষয়টিকে রাষ্ট্রের সব ধরনের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। বাজেটে এমনভাবে বরাদ্দ প্রদান করা, যাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা সম্ভব হয়।

দেশ যখন মধ্যম আয়ের দেশ হতে চলেছে তখন অর্থনৈতিক পরিসরে নারীর অংশগ্রহণ অবশ্যই বাড়াতে হবে। মূল কথা হলো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। জেন্ডার বাজেট সেসব জায়গা থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নারীকে কাজে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা থাকবে। সেটা থাকবে বলে নারীকে দূরে রাখার সুযোগ নেই। জরুরি হলো, সামাজিক বাধাগুলো চিহ্নিত করে সেটা অপসারণ করার কৌশল নির্ধারণ করা। উল্লেখ্য, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে নারী উন্নয়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড রয়েছে এমন চারটি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ধীরে ধীরে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪০টি এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৩টি মন্ত্রণালয় বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২২ অর্থবছরে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার রয়েছে এমন ৪৪টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে সরকার জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে ৪৩টি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ৩টি গুচ্ছে ভাগ করে প্রতিবেদন তৈরি করে। এগুলো হচ্ছে:

এক. নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কৌশলের অধীনে রয়েছে ৯টি মন্ত্রণালয়;

দুই. উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রম বাজার ও আয় বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত কৌশলের অধীনে আছে ৯টি মন্ত্রণালয়; এবং

তিন. সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি করার কৌশলের অধীনে রয়েছে ২৫টি মন্ত্রণালয়।

বিগত বছরগুলোর বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে নারী উন্নয়নে বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। যেখানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জেন্ডার বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৬৪ হাজার ৮৭ কোটি টাকা, সে তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ বেড়েছে অনেক। ২০২১ অর্থবছরের বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ হয় ১ লাখ ৯৮ হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩২ দশমিক ৭৮ শতাংশ ছিল (জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশ)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৩৩ দশমিক ৮৪ ভাগ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট যা জিডিপির ৫.১৬ শতাংশ। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি'র) ৫ নম্বর লক্ষ্য হচ্ছে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারীর ক্ষমতায়ন। এই এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর। পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে গত কয়েক অর্থবছর থেকে জাতীয় বাজেটের সঙ্গে আলাদা করে জেন্ডার বাজেট ঘোষণা করা হচ্ছে।

জেন্ডার বাজেটের মূল উদ্দেশ্য নারীরা যে সব ক্ষেত্রে বৈষম্য বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, তা হ্রাস করে নারীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এজন্য বাজেট নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু ভূমিকা রাখছে, বরাদ্দ সঠিক খাতে হচ্ছে কিনা, এসব বিষয়ের মূল্যায়ন প্রয়োজন। যেখানে নারীর বৈষম্য দূর করার কথা, সেখানে দেখা যাচ্ছে তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেই বিরাট ঘাটতি। নারী প্রত্যেক জায়গায় প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে জেন্ডার বাজেটের ফলাফল ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে দেখা দরকার। ২০১৯-২০ সালের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় নারীর জন্য কাজের পরিবেশ সৃষ্টি ও সুযোগ বৃদ্ধিতে ডে কেয়ার প্রতিষ্ঠা জরুরি বিবেচনায় নিয়ে সেটি করণীয়

তালিকায় রেখেছে। এছাড়া নারীর সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, নারীবান্ধব কাজের সুযোগ, নারীকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকারি জনসেবায় দরিদ্র নারীদের প্রবেশগম্যতাকে তাদের উন্নয়নের একটি ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সবকিছু বিবেচনা করে নারীদের কার্যকরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের দাবি গত কয়েক বছর ধরেই উচ্চারিত হচ্ছে।

নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা দূর ও নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করতে হলে শুধু নাম কাওয়াস্তে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করলেই হবে না, আরো কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাজেট বিশ্লেষণের যে ৩টি স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে, তার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি গুণগত বিশ্লেষণ করার জন্য পরিমাপক নির্ধারণ করতে হবে। বিশেষত জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বরাদ্দ দেখানোর পাশাপাশি সেই বরাদ্দকৃত বাজেট আসলে নারীর কোন কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা পূরণ করছে এবং তার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ থাকতে হবে। কেবল সেফটিনেট প্রকল্প কিংবা ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক কর্মসূচিতে নারীর উন্নয়ন সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ সহায়ক পদক্ষেপে গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নারীর সমস্যা চিহ্নিত করে সে সব সমস্যা সমাধানে ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে আলাদা জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা দরকার। আর নারী উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্বাচনে ও প্রণয়নে নারীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং নারীর প্রয়োজন সঠিকভাবে নির্ণয় করে এ ধরনের প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে নারীকে নিয়োগ দিতে হবে। জেন্ডার বাজেটের আকার ও পরিধি বাড়ানো হয়েছে। একই সঙ্গে নারীর অধিকার নিশ্চিত ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জগুলোও চিহ্নিত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, উৎপাদন, শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক নারীর ও সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি তিন থিমে ৪৪টি মন্ত্রণালয়কে জেন্ডার বাজেটের আওতায় আনা হয়ে থাকে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেটে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ শতকরা হার যথাক্রমে ৬৯.৭১, ৬০.২১, ৫০, ৪৪.৭৩ এবং ৪৩.০৪ শতাংশ।

জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এনজিও ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মনিটরিং সেল গঠন করা যেতে পারে। এই সেলের কাজ হবে জেন্ডার বাজেটের কর্মসূচিগুলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে দেখা। এখন প্রায় সব মন্ত্রণালয়ে নারীদের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। সর্বোপরি, বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে খরচ হচ্ছে কি-না, বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা মনিটর করা এবং অর্থবছর শেষে কতটুকু চাহিদা পূরণ হলো, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এবং এর প্রতিফলন পরবর্তী বাজেটে আসতে হবে।

উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা না হলে গতানুগতিক জেন্ডার বাজেট ঘোষণা নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনো সুফল বয়ে আনবে বলে মনে হয় না। নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নতি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের পূর্বশর্ত। নারীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের নিয়ামক। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রতিটি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও ক্ষমতায়ন দৃশ্যমান। অনগ্রসর নারীদের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার নারীবান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়ন করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীদের আইটি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে সরকার। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ চলছে। নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার ও সমাজে ভূমিকা রাখছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগের কারণেই আজ নারীদের এ অগ্রগতি।

বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গড়ে তুলতে নারীদের বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এসে সকল প্রকার কার্যক্রমে মেধাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। জাতিসংঘের প্ল্যানেট ৫০-৫০ অর্জন এখনও সম্ভব হয়নি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমতা-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে নারী-পুরুষ হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। ■

সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

শিশুশ্রম নিরসনে করণীয়

তানজিনা আক্তার

কোনো শিশুকে জোড়পূর্বক কাজে নিযুক্ত করাকে শিশুশ্রম বলে। অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে শারীরিক ও মানসিকভাবে জোড় করে কোনো কাজ করতে বাধ্য করাকে শিশু শ্রম বলে।

জাতীয় জরিপ থেকে দেখা যায়, ৫-১৪ বছর বয়সি দেশের ১৩ শতাংশ শিশু কাজ করছে যাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ। আমাদের জন্য শিশুদের জানা দরকার যে, তাদের মতো বয়সের শিশুরাই শ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে যাচ্ছে এবং নানাভবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এই কোমলমতি শিশুদের হাত এক দিকে শ্রমের মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সহায়তা করছে আর অন্যদিকে সঠিক সময়ে যথোপযুক্ত সুবিধা পাওয়ার অভাবে তাদের জীবনমানে মৌলিক সুবিধা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সমাজে শিশুশ্রমের কয়েকটি কারণ উপস্থাপন করা যেতে পারে -

১। শিশু শ্রমিকরা বয়স্কদের তুলনায় সস্তা

২। শিশু শ্রমিকরা অনুগত ও বাধ্যগত হয়

৩। শিশু শ্রমিকরা বয়স্কদের তুলনায় দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় জরিপ থেকে দেখা যায় শিশু শ্রমিকদের মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যাই বেশি। ছেলেদের সংখ্যা ১৭.৫ শতাংশ আর মেয়েদের সংখ্যা ৮.১ শতাংশ। পল্লি এলাকায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা শহর এলাকার তুলনায় বেশি। আদিবাসী এলাকাগুলোতেও শিশুশ্রম প্রায় ১৮ শতাংশ। বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে কম (৯ শতাংশ) এবং রাজশাহীতে সবচেয়ে বেশি ১৭ শতাংশ। এছাড়াও বাংলাদেশের খাত অনুযায়ী শিশুশ্রমের সংখ্যা কমবেশি রয়েছে।

আমাদের দেশে শিশুরা সাধারণত কৃষি, কলকারখানা, গণপরিবহণ, আবাসন, খাবারের রেঁস্তোরা, বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ইটভাটা, জাহাজ নির্মাণ কারখানায় বেশি কাজ করে। এগুলোর মধ্যে কিছু কাজ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, যা শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত নয়। উপরিউক্ত শিশুশ্রমগুলোর মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণগুলো হচ্ছে ইটভাটা, কলকারখানা, গণপরিবহণ এবং জাহাজ কারখানার কাজ। আর অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে আবাসন, খাবারের দোকান, সাধারণ কৃষি, বিভিন্ন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো।

বর্তমানে দরিদ্র ও বৈষম্যের পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি শিশু শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। অনেক

স্কুলে যাওয়া শিশু স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে এবং কাজে যুক্ত হয়েছে। এভাবে দেখা যায় শিশুশ্রমে জড়িত না থাকা শিশুরা কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রথম ধাপে যোগদান করছে এবং পরবর্তীতে অধিক অর্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যোগ দিচ্ছে। নিয়োজিত শিশুদের সাথে এবং তাদের পরিবারের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, স্কুল থেকে ঝরে পরা নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও অনেক শিশুর পরিবারই অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হচ্ছে বলে এই শিশুশ্রমে তাদের তেমন কোনো নেতিবাচক মনোভাব নেই। উপরন্তু তারা পারিবারিকভাবে সচ্ছল হতে পারছে। যেমন– বাসাবাড়িতে যেসব মেয়ে শিশুরা কাজ করছে তাদের বাবা-মা খানিকটা চিন্তামুক্ত হচ্ছে যে সেই শিশুর বিয়ের দায়িত্ব আর তাদের থাকছে না। অর্থাৎ বিয়ের সময় একটা মোটা অঙ্কের টাকা পেলে তা দিয়ে সহজেই মেয়ের যৌতুক দিতে পারবে। এছাড়াও তাদের স্বস্তির জায়গা হলো তাদের মেয়েরা তাদের বাড়ির তুলনায় ভালো খাবার খাচ্ছে এবং ভালো জায়গায় ঘুমাতে পারছে ও ভালো কাপড় পরিধান করতে পারছে।

তবে এক অংশের মনোভাব ইতিবাচক হলেও অনেকক্ষেত্রেই এর নেতিবাচক দিকটিও ফুটে উঠছে প্রকটভাবে। শিশু গৃহকর্মীরা নানাভাবে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় মালিক পক্ষের দ্বারা। অনেক সময় শারীরিক নির্যাতন না ঘটলেও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আমাদের কোমলমতি শিশুরা। অনেক গৃহকর্মীকে ঘরে রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। এতে সেই গৃহকর্মী মানসিকভাবে কতখানি ভীত বা অসুস্থ থাকছে সেদিকে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থাকছে না গৃহকর্তার।

এছাড়াও কম ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমগুলোর মধ্যে খাবারের দোকানের কাজ এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত রয়েছে অনেক শিশু। এই সব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিশুর পরিবার খানিকটা স্বস্তি পায় যে তাদের সন্তান একটি কর্মের সন্ধান পেয়েছে এবং উপার্জন করছে যা পরিবারের স্বচ্ছলতা খানিকটা পূরণ করছে। তবে এখানেও কিছু নেতিবাচক দৃশ্য প্রতিনিয়তই আমাদের চোখে পড়ে খাবারের রেস্তোরাঁ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকরা অনেক খাবারের মাঝেও মানসম্মত ও যথোপযুক্ত খাবার পাচ্ছে না।

কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো খানিকটা সহনশীল হলেও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো আমাদের দেশের শিশুদের জন্য অতিমাত্রায় বিপদজনক। আমরা রাস্তায় বেরুলেই দেখতে পাই গণপরিবহণগুলোতে সহযোগীর কাজ করে চলছে শিশুরা। গণপরিবহণের গেটে ঝুলে ঝুলে তারা প্রতিনিয়ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। এতে করে অনেক পরিবহণ শিশুশ্রমিক প্রাণ হারাচ্ছে এবং তাদের বয়সের তুলনায় বেশি ভারী কাজের প্রভাবে তারা তাদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে অনেক শিশুই জাহাজ, কারখানাসহ অনেক কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যা তাদের বয়স ও শারীরিক অবস্থান অনুযায়ী যথার্থ নয়।

আলোচনার ইতিবাচক ও নেতিবাচকতার মাঝেও বলতেই হয় যে শিশুশ্রম একটি মানবিক বিপর্যয়জনিত কাজ। সাময়িক অভাব ও অর্থের প্রয়োজনে অভিভাবকরা শিশুদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করলেও এর সুফলের চেয়ে কুফলের পরিমাণটাই বেশি। অপরিণত বয়সে অধিক শ্রমের ফলে এদেশের কোমলমতি শিশুরা মানসিক ও শারীরিক নানা রোগে ভুগতে থাকে এবং তারা নানা ধরনের অপুষ্টির মধ্য দিয়েই তাদের বাকি জীবন অতিবাহিত করে। শিশু শ্রমের ফলে দেশের একটি নতুন প্রজন্ম শুরুতেই ঝরে যাবে এবং অনেক সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটবে।

- এজন্য শুধু শিশুশ্রম আইন কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।
- সাধারণ নাগরিকেরও কর্তব্য থাকবে শিশু শ্রমকে নিরুৎসাহিত করা।
- অপেক্ষাকৃত নিচু মর্যাদার কাজে শিশুরা যাতে অংশগ্রহণ না করে সেদিকে সমাজ কর্মীদের দৃষ্টি থাকতে হবে।
- সব শিশুর মানসম্মত শিক্ষায় অগ্রগতি নিশ্চিত করা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রদানের গুরুত্বারোপ করা

সর্বোপরি শিশুদেরকে মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করতে সর্বসাধারণের ও রাষ্ট্রের এগিয়ে আসার মাধ্যমেই শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।■

প্রাবন্ধিক

গল্প

ïqvcvKv‡`i †evKvwg

মাহমুদ জামিল

ভারি মিষ্টি এক শুঁয়াপোকা। নাম তার টুই। বাসা বেঁধেছে ওই কচুবনে। টুইয়ের মতো আরো যারা শুঁয়াপোকা, তাদের বাসাও ওখানটায়। বেশ আরামেই ঘরকন্না পেতেছে সবাই। প্যাচপ্যাচে কচুপাতার একটা করে তোশক আছে ওদের। আর মস্ত কচুর যে পাতাগুলো মাথার উপর চাঁদোয়া পেতেছে, বেশ আরামেই ঘুমায় ওরা সেখানে। তারপর সূর্য উঠব। ওঠব করতেই শুঁয়াপোকাদের ঘুম ভেঙে যায়।

সারারাতের ঘুম ঝাড়তে তাই তুলতুলে পেটটা মুচড়ে নেয় দুই পাক। তারপর শিশিরের জলে পেট-মাথা ভিজিয়ে আয়েশ করে রোদ পোহাতে বসে। রোদ পোহাতে পোহাতে খিদেটাও লাগে বেশ। ওমনি পাঁচ আঙুল ডিঙিয়ে গিয়ে বসে তেলাকুচার কচি পাতাটার ওপর। কুচ...কুচ...কুচ । এমনি পাতা ছিঁড়ে খায়। সকালে এক বেলা খায়। পেট ভরলে পাতার তলাতে ওমনি ঘুম দেয়। দুপুরে খায়। আবার ঘুমোয়। বিকেলেও তাই। রাতে আর খিদেই থাকে না। সাঝ পড়তেই শুঁয়াপোকারা কচুপাতার তলায় এসে পাতার তোশকে বসে। তখন আকাশে মাছের চোখের মতো তারা ফুটে। জোছনার ঢলে খোলা মাঠ একেবারে চুপ চুপ করে। আর শুঁয়াপোকারা বসে বসে আকাশের পানে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যা হতেই জোনাক পোকাদের টহল শুরু হয়ে যায়। টিমটিমে আলোর বাতি নিয়ে ওরা টহল দিয়ে বেড়ায়। আরেকটু রাত বাড়তেই ঝিঁঝিদের গানের জলসা জমে চুরচুর হয়। শুঁয়াপোকাগুলো তখন একমনে সে গান শুনে আর ঢুলে। ঢুলে আর শুনে। এমনি করে কখন যে ঘুমিয়ে পরে নিজেরাও জানে না!

এমনি করে টুইদের দিনমান ভালোই কাটছিল। শেষে আসতে আসতে বোশেখ মাসটা এসে গেল। ওমনি টুইয়ের হলো মন খারাপ! বোশেখ মাসটা ওর একদম ভালো লাগে না। বোশেখ মাস যে ঝড়বাদলের মাস! ঢল নামার মাস! আর ঝড়বাদলে শুঁয়াপোকাদের হয় ভীষণ বিপদ। বৃষ্টির জলে ভিজে গেলে শুঁয়াপোকাদের 'গা ফোলা' ব্যারাম হয়। গতরখানা যা ম্যাজম্যাজ করে! নড়তে চড়তে হয় ভারি অসুবিধে! আর হোৎকা বোকাদের নিয়ে তো বড়ো ঝামেলা! বৃষ্টির মিষ্টি জল খেতে পেলে ওদের হুঁশ থাকে না। চুঁ চুঁ করে খাবে তো খাবেই! পেট ফুলে ঢোল হলো না কুমড়ো হলো সে খেয়ালটাও রাখবে না। টুই এসব কথা বেশ জানে। তাই তো সকাল সকাল গোসল সেরে ওমনি রোদ পোহাতে বসে। নাহলে রাতে যদি সর্দি-গর্মি লেগে গা ফুলে বসে!

টুইয়ের ভাবনা

ঠিকঠাক মিলে গেল। একদিন রাতে বাতাস ভারি হয়ে উঠল। হাওয়া মিলিয়ে বেশ গরম জেঁকে বসল। গাছের পাতা কি কুটোটিও নড়ে না! ঘেমে জুবজুবে সবকটা শুঁয়াপোকা। শেষে কিনা পাতার ঘুমঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে এলো বাইরে।

'আহ, দু'ফোঁটা পানি পেলে গা জুড়ায়!' এই যখন সবাই ভাবছে, হাওয়া লাগল দমকা। একটু পর আকাশ কালো করে নামল টুপটাপ বৃষ্টি। প্রথমে নেমে এল ছোটো ছোটো ফোঁটা। বৃষ্টির ছানাপোনা যাকে বলে! তারপর বড়ো বড়ো ফোঁটা। গলাগলি ধরে ঝরতে লাগল। থামার নামটি নেই। সে কি পানির ঢল! পানি জমে জমে কচুপাতার মাঝামাঝি একটুখানি পুকুর হলো! তাই দেখে বোকা শুয়াপোকাগুলো তির তির করে পাতার ওপর ওঠে এলো।আর মজা করে সেই পুকুরে গা ঢেলে দিল। টুই তো এই ভয়টাই করছিলো। ওদের এমন বোকামি দেখে পিছু ডাকল, 'একী করছো তোমরা? জলে ভিজলে যে ভারি বিপদ! সে কি ভুলে বসলে?' টুইয়ের কথা কে গায়ে মাখে! বুড়ো শুঁয়াপোকাটা নাক-মুখ কুঁচকে তো বলেই দিলো,'আরে রাখ না তোর খেচরমেচর! ছ'মাস বাদে বৃষ্টিটা নামল। তাতে বুঝি এট্টু ভিজতে নেই! খুব যেন সেয়ানা! নিজে তো ভিজবি না, আমাদেরও মানা করছিস।' বুড়োর মুখে ওমন কথা শুনে টুই থ! জলে ভেজার বিপদ ওরা সবাই জানে। তারপরও কী বোকামিটাই না করছে। খানিক মজার লোভে বুঝি? হবেও বা! টুই তাই ভাবে। ও ঠিক বুঝে গেছে, শত ডাকলেও ওরা আর ফিরবে না। তবে আর কীসের দেরি? নাহ দেরি করলে চলে না! ওকে যে শুকনো থাকতে হবে! টুই খুঁজে পেতে পেল এক লম্বা কচুর মোচা। বেশ করে মোড়ানো মোচার ভেতর জল ঢোকার কায়দাটি নেই। টুই তুরতুর করে উঠে এল মোচার মাথায়। তারপর সাবধানে সেঁধিয়ে গেল ওটার ভেতরে। একটুও সে ভিজল না! আর বাকি শুঁয়াপোকারা ভিজে হলো একশা। আর জল গিলে হলো থকথকে তোকমার দানা।

বৃষ্টি থেমে সকাল হয়েছে। আর ওদিকে আরেক কাণ্ড! পিঁপড়ে পাড়ায় বেঁধেছে মহা হইচই। রাতের বৃষ্টিতে নাকি ওদের চাল-ডাল সব কাদায় গুলে গেছে। হাজারে হাজার পিঁপড়ের ছানা। ওদের যে এখন খেতে দিতে হয়! পিঁপড়ে সর্দার তাই খাবারের খোঁজে বেরিয়েছে পল্টন নিয়ে। ও কী সেপাই! চলছে সব কাতারে কাতারে। সারি বেঁধে আড়ি পেতে। আর শেষে আসবি তো আসবি, এসে হাজির সেই শুঁয়াপোকাদের ডেরায়! লালমুখো একপাল পিঁপড়ে সেপাই। বাঁকা ইয়া দুটো কটমটে দাঁত। তাই দেখে তো শুয়াপোকারা ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল। কেউ কেউ ছুট লাগাতে গেল। ওমা! শরীর যে ডানেও হেলে না, বামেও হেলে না। জলে ভিজে গা যে ফুলে ঢোল! আর সে কী ব্যথা গো! এবার ওরা বুঝল, টুইয়ের কথা না শুনে কী ভুলটাই না করেছে। পিঁপড়ে সেপাইদের একটু লড়াইও করতে হলো না। বোকার হদ্দ সবকটা শুঁয়াপোকাকে ঘাড়ে বেঁধে নিয়ে চলল বাড়ি। তাই দেখে পিঁপড়ে ছানারা এল পিলপিল করে। আর সবকটা শুঁয়াপোকাকে খেয়ে নিল চাকুম চুকুম করে।

সেই যে টুই, বৃষ্টিতে ভিজেনি। প্যাচপ্যাচে কচুপাতার তোশকে সে এখনও ঘুমায়। ঝিঁঝির গান শুনে। রাতের চাঁদ দেখে। আর জোনাকির সাথে গল্প জমায়। তবে শুঁয়াপোকাদের কথা মনে পড়তেই চোখ ভরে জল আসে তার। সে জল ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলে পাতার ওপর। পাতায় কখনো শুঁয়াপোকা পেলে, তুমিও দেখতে পাবে সেই ফোঁটা!■

গল্পকার

বাদামের খোসা

রকিবুল ইসলাম

টিপুরা আজ বেড়াতে যাচ্ছে ওদের ফুফুদের বাড়িতে। মা-বাবা, দাদু-দাদি আর ছোটো ভাই পিপু। টিপু কোনোদিন ট্রেনে ওঠেনি। তাই তার আনন্দটাও অনেক বেশি। পিপুও না। ওরও তাই আনন্দ আর ধরে না। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছে। অন্যদিন ডেকে ডেকেও যাকে তোলা যায় না সে আজ না ডাকতেই বাবুসাব! পিচ্চি পিপুও উঠেছে খুব ভোরে। সকালের নাশতা সেরে ওরা রওনা দিলো রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে। ট্রেন এলে সবাই ট্রেনে উঠল। টিপুর বাবা খুব ব্যস্ত। তিনি সিটের হিসাব মেলাচ্ছিলেন। ছয়টা সিট ঠিকঠাক মতো পাওয়া গেলেই তার ব্যস্ততা কমে। মুখোমুখি সিট হয়েছে ওদের। এক লাইনে বাবা-মার মাঝে পিপু। অন্য পাশে দাদু-দাদির মাঝে টিপু। টিপু আর পিপুর দৃষ্টি জানালার বাইরে। কী যে ভালো লাগছে ওদের!

‘এই বাদেম... এই বাদেম...’ বলতে বলতে এক বাদামওয়ালা এল।

পিপু বলল, আম্মু বাদাম খাবো।

বাবা পিপুকে বাদাম কিনে দিলেন। টিপু আর পিপু মনের সুখে বাদাম খেতে লাগল। টিপু বাদাম ছিলে খাচ্ছে। আর বাদামের খোসা নিচে ফেলছে। পিপুও বাদামের খোসা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। মা পিপুকে সাহায্য করছেন। দাদু দেখলেন টিপু বাদামের খোসা নিচে ফেলছে। দাদু হাত দিয়ে টিপুকে বাধা দিলেন। টিপু কিছু বুঝল না।

দাদু বললেন, উঁহু। খোসা নিচে ফেলতে নেই।

টিপু বললেন, কেন দাদু। অনেকেই তো নিচে ফেলছে।

দাদু দেখলেন করিডোরের ওপাশে বসা একজন বাদামের খোসা নিচে ফেলছে।

দাদু বললেন, ট্রেন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। এটা রক্ষণাবেক্ষণ করাও আমাদের দায়িত্ব। তাছাড়া খোসা নিচে ফেললে জায়গাটা নোংরা হবে।

টিপু বলল, তাহলে খোসা সহ-ই কি খেতে হবে?

দাদু বললেন, পাগল ছেলে! খোসা কেন খাবে? খোসা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবে। সেখানে জমিয়ে পরে কোথাও ফেলে দিবে।

টিপুর মা একটা পত্রিকার পাতা বের করে দিলেন। বললেন, এই যে এখানে রাখো। খাওয়া শেষে বাইরে ফেলে দিলেই হবে।

দাদু আবার বললেন, শোনো, শুধু ট্রেনেই না। কোনো কিছুই যেখানে-সেখানে ফেলবে না। এতে পরিবেশ নোংরা হয়। নোংরা পরিবেশ দেখতে খারাপ লাগে। তা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। সভ্য মানুষেরা কখনও পরিবেশ নোংরা করে না। একটা চকলেটের খোসাও যেখানে-সেখানে ফেলে না। পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তা না ফেলে পকেটে করে নিয়ে যায়। জায়গা মতো বের করে ফেলে দেয়।

দাদুর কথা শুনে টিপু হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, তাই বলে চকলেটের খোসা পকেটে নিয়ে যায়!

শুধু তাই নয়, সভ্য মানুষ যেখানে-সেখানে থুথুও ফেলে না। এভাবে থুথু ফেললে রোগের জীবাণু ছড়ায়। এতে দেশে রোগের উপদ্রপ বেড়ে যায়।

টিপু বলল, আমি কিন্তু যেখানে-সেখানে থুথু ফেলি না। মা আমাকে অনেক আগেই শিখিয়েছেন। মা আমাকে আরো অনেক কিছু শিখিয়েছেন।

দাদু বললেন, আর কী কী শিখিয়েছেন তোমার মা?

টিপু বলল, মানুষের সামনে হাঁচি আর কাশি দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে একটু দূরে সরে গিয়ে দিতে হবে।

দাদু শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, বাহ!, তুমি তো অনেক কিছু শিখেছ! এজন্যই বলা হয়, মা-ই প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনলে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারবে। আর এসব তো...

টিপু বলল, ছোটো থেকেই শিখতে হবে।

টিপুর কথা শুনে সবাই হাসতে লাগল।

সবাই মিলে বাদাম খেতে লাগল। পিপুও খোসা ছাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও বাদামের খোসা ছাড়াতে পারছিল না। আর এটা দেখে সবাই হাসতে লাগল।

বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমরা গল্পটির মূল কথা বুঝতে পেরেছ। টিপু তাহলে কী শিখল? যেখানে-সেখানে কোনো কিছু সে ফেলবে না। কিছু ফেলতে হলে তা অবশ্যই নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবে। তাহলে তোমরাও এটা শিখে রাখো। আমাদের যত অসুবিধাই হোক পরিবেশ দূষণ করা থেকে বিরত থাকব। আমাদের পরিবেশ আমাদেরই পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ■

গল্পকার

মুয়াজ হোসেন, ৪র্থ শ্রেণি, আখাউড়া রেলওয়ে স্কুল, বি-বাড়িয়া

‘বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ-ঐতিহাসিক ছয় দফা’

হোমায়েদ নাসের

ছোট্ট বন্ধুরা, দেশকে ভালোভাবে জানতে হলে দেশের ইতিহাস জানতে হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের ছয় দফার নিবিড় ও বিস্তারিত পাঠ একান্ত জরুরি। এর মধ্যে দিয়েই আমরা বুঝতে পারব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ছয় দফার মাধ্যমেই নির্মাণ করেছিলেন বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি।

প্রতি বছর আমাদের জাতীয় জীবনে ৭ই জুন তথা ‘ছয় দফা দিবস’ ফিরে আসে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা দিনটি পালন করি। আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ছয় দফা ও ৭ই জুনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭ই জুন ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস। ১৯৬৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য তীব্রতর হতে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দলটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপনের জন্য সাবজেক্ট কমিটিতে পেশ করেন। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সম্মেলন বর্জন করে। লাহোর ছাড়ার আগেই বঙ্গবন্ধু সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফা উত্থাপন করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা প্রস্তাব ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ই জুন ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলনের সূচনা হয় এবং ৭ই জুন আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে ১১ জন বাঙালি শহিদ হন।

ছয় দফা আন্দোলনের পথ ধরেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১১ দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, এরপর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাঙালি পায় চূড়ান্ত বিজয়ের স্বাদ।

যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি ছয় দফার কথা মনে রাখবে। মনে রাখবে ছয় দফার মহান প্রবক্তা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বন্ধুরা, ৭ই জুনের চেতনাবহ দিনটি আমাদের জীবনে অম্লান হয়ে থাকুক। এই দিনে যে সকল শহিদ ভাইয়েরা তাঁদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে বাংলার মানুষের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে গিয়েছেন, আমরা পরম শ্রদ্ধা ভরে তাঁদের স্মরণ রাখব। শহিদের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে জাতির পিতার সংগ্রামী চেতনার ভিত্তিতে, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আমরা উন্নয়নের নবদিগন্তের সূচনা করেছি। ■

প্রাবন্ধিক

ধ্বনির অর্থ

তারিক মনজুর

ধ্বনির কি কোনো অর্থ আছে? পিলটু জানে, ধ্বনির কোনো অর্থ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা পরীক্ষা ছাড়া বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। সে বিভিন্ন বয়সের কয়েকজনের কাছে গিয়ে পরীক্ষার কাজ শুরু করল। প্রথমে মার কাছে গিয়ে বলল, ‘মা, ‘ক’ মানে কী?’

মা হেসে বললেন, ‘ক মানে বল্। অনেকেই বলে ‘তুই ‘ক’; মানে তুই বল্।’

পিলটু খাতায় লিখল, ক – বল্।

এরপর নেহাকে ফোন করে বলল, ‘নেহা, খ মানে কী?’

নেহা বলল,‘খ মানে আকাশ।’

খ মানে আকাশ! পিলটু আকাশ থেকে পড়ল। গগন মানে আকাশ; নভ মানে আকাশ; কিন্তু খ মানেও যে আকাশ এটা ওর বিশ্বাস হতে চায় না। তবু খাতায় লিখল, খ – আকাশ।

তারপর বিনুকে ফোন করে বলল, ‘আচ্ছা বিনু, গ মানে কী?’

বিনু প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে পারেনি। তাই পিলটুকে আবার বলতে হলো। বিনু হেসে বলল, ‘গ-এর আবার অর্থ আছে নাকি!’

পিলটু খাতায় লিখল, গ – অর্থ নেই।

আরও কয়েকজনকে অন্যান্য ধ্বনির অর্থ জিজ্ঞেস করল পিলটু। এরপর খাতায় সেগুলো লিখতে থাকল। আট-দশটা ধ্বনি নিয়ে লেখার পর সে সিদ্ধান্ত নিল, ধ্বনির অর্থ থাকতে পারে; নাও পারে। তারপর ভাষা-দাদুকে ফোন করে পিলটু তার সিদ্ধান্তের কথা জানালো।

ভাষা-দাদু পিলটুকে শুরুতেই ধন্যবাদ দিলেন এ রকম একটি পরীক্ষা চালানোর জন্যে। তিনি খুব প্রশংসাও করলেন। বললেন, ‘আমরা তো শুনেই সবকিছু বিশ্বাস করি। তুমি পরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করতে চাচ্ছ। এটি ভালো।’

পিলটু বলল, ‘কিন্তু, দাদু, আমার সিদ্ধান্ত ঠিক কী না, সেটা বলো।’

দাদু বললেন, ‘প্রথমত ধ্বনির কোনো অর্থ নেই। তবে...’

‘তবে ক মানে বল্, খ মানে আকাশ... এ রকম অর্থ পাওয়া যাচ্ছে কেন?’

‘যখন ক মানে বল্, খ মানে আকাশ এ রকম পাচ্ছ,’ ভাষা-দাদু বলতে থাকেন,‘তখন ক, খ এগুলো শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শব্দ হওয়ার জন্য সাধারণত একাধিক ধ্বনি লাগে। এসব ক্ষেত্রে একটি ধ্বনি দিয়েই একটি শব্দ তৈরি হচ্ছে।’

পিলটু বলল, ‘বুঝেছি। ধ্বনির কোনো অর্থ নেই।’

‘হ্যাঁ, ধ্বনির অর্থ নেই। তবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ধ্বনি বিষয়ে চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।

আমি সেটি আরেকবার পড়ে তোমার সাথে কথা বলতে চাই।' এই বলে দাদু ফোন রেখে দিলেন।

পরদিন ভাষা-দাদু নিজেই ফোন দিলেন পিলটুকে। বললেন, 'টেবিলে টোকা দিলে কেমন শব্দ হয়?'

পিলটু বলল, 'টকটক কিংবা টুকটুক।'

দাদু বললেন, 'ট-বর্গের ধ্বনির সাথে কাঠিন্যের একটা সম্পর্ক আছে। তাই টকটক, টুকটুক এ রকম শব্দ পাওয়া যায়। টুকটাক, টক্কর, ঠকঠক, ঠুকঠাক, ঠোকর এসব শব্দে কঠিন জিনিসের সাথে কঠিন জিনিসের সংঘর্ষের পরিচয় দেয়। আবার, ত-বর্গের ধ্বনির সাথে তারল্যের সম্পর্ক আছে। কোমল জিনিসে কোমল জিনিসের আঘাতে অথবা কোমল জিনিসে কঠিনের আঘাতে ত-বর্গের ধ্বনির সৃষ্টি হয়। মানুষের কোমল হাতের পরস্পর আঘাতের শব্দ তাইতাই। কোমল পায়ের সাথে কঠিন মাটির স্পর্শে শব্দ হয় থপথপ।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, দাদু।' পিলটু ব্যস্ত হয়ে বলে, 'এসব কথা দিয়ে তুমি কী প্রমাণ করতে চাইছ, আগে বলো।'

ভাষা-দাদু বলেন, 'আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাইছি না। আমি শুধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কিছু কথা তোমাকে শুনাচ্ছি। তিনি বলেছেন, প্রাকৃতিক শব্দ বা ধ্বনির সাথে ভাষার ধ্বনির সম্পর্ক আছে। আবার ভাষার ধ্বনির সঙ্গে ভাষার শব্দেরও সম্পর্ক আছে। ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলনে শব্দ তৈরি হয়; সেই শব্দের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্ক গভীর।'

পিলটু বলল, 'আচ্ছা, এবার তুমি আরো উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।'

ভাষা-দাদু ফোনের ওপাশ থেকে প্রশ্ন করেন, 'ভাঙা ঘরের চাল থেকে ঘরের ভিতর বৃষ্টির পানি কীভাবে পড়ে?'

পিলটু বলল, 'টপটপ করে বা টুপটাপ করে।'

দাদু যোগ করেন, 'আর বৃষ্টি থামতে শুরু করলে টিপটিপ করে পড়তে থাকে। ...ট-এর ধ্বনি কঠিন;তাই তরল ও বায়বীয় পদার্থে ট-ধ্বনিকে আসতে হয় প-এর সাথে। যে কারণে বৃষ্টি পড়ে টপটপ, টুপটাপ; আবার পুকুরের জলের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ টাপুরটুপুর। প-ধ্বনির সঙ্গে বাতাসের সম্পর্ক আছে; সেজন্য ট-এর পরে প।'

'দাদু, তুমি বলছ, প-ধ্বনির সাথে বাতাসের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প-বর্গের ধ্বনিগুলো তো ওষ্ঠ্য ধ্বনি।'

'হ্যাঁ, প-বর্গের ধ্বনিগুলো ওষ্ঠ্য ধ্বনি। প ফ ব ভ এই ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরকার বাতাস দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়ে বের হয়। দুই ঠোঁট জোড়া হয়ে বাতাসের পথ বন্ধ করে রাখে; বাতাস দুই ঠোঁটের মধ্যে পথ করে বের হয়। একইভাবে, ফাঁপা জিনিসের মধ্যে আবদ্ধ বায়ু বের হয়ে আসলে এ রকম ধ্বনি তৈরি হয়। যেমন, হাঁস ডাকে কীভাবে, বলো।'

'হাঁস তো প্যাঁকপ্যাঁক শব্দ করে।'

ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক শব্দ করে। হাঁসের দুই ঠোঁটের ভিতর থেকে ওই শব্দে বাতাস বের হয়। আবার ফাঁপা জিনিসের ভেতর থেকে বাতাস বের হলে শব্দ হয় ফস, ফিস, ফুস।'

'দাদু, স শিসধ্বনি। শিসধ্বনির সাথেও তো বাতাসের সম্পর্ক আছে।'

'দারুণ বলেছ!' ভাষা-দাদু খুবই খুশি হন পিলটুর কথায়, 'শ ষ স এগুলো শিসধ্বনি; এগুলোর সাথেও বাতাসের সম্পর্ক আছে। ফস, ফিস, ফুস এসব শব্দে ফ-এর পরে শিসধ্বনির অবস্থান বাতাসের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। সাপের মুখের ভিতর থেকে শব্দ বের হয় ফোঁস। লোকে ফুসফাস করে বা ফিসফিস করে কথা বলে বা গোপনে পরামর্শ করে। আবার বুকের ভিতরে যে যন্ত্র থেকে শ্বাসবায়ু বের হয়, তার নাম ফুসফুস।'

পিলটু বলল, 'বুঝলাম, আওয়াজ বা শব্দের সাথে ধ্বনির সম্পর্ক আছে। আবার ধ্বনির সাথে ভাষার একেকটি শব্দেরও সম্পর্ক আছে। কিন্তু দাদু, আমার আসল প্রশ্নটাতেই প্যাঁচ লেগে গেল। ধ্বনির সাথে অর্থের কি কোনো সম্পর্ক আছে?'

ভাষা-দাদু হাসেন। বলেন, 'এই আলোচনার পরে সহজ প্রশ্নটাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে! সহজ করে উত্তর দিলে হবে, ধ্বনির কোনো অর্থ নেই। আর কঠিন করে উত্তর দিলে হবে, ধ্বনির মধ্যে খুঁজলে অর্থ পাওয়া যায়। ...ধ্বনির চেয়ে বড়ো উপাদান শব্দ। শব্দের জন্য কিন্তু ঠিক বিপরীত কথা। সাধারণভাবে বলা হয়, শব্দের অর্থ আছে। কিন্তু আদৌ শব্দের কোনো অর্থ আছে কি না, এটা অনেক বড়ো দার্শনিক প্রশ্ন। ■

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্মৃ তি ক থা

গ্রামের সরল পথে ভালোবাসার শৈশব

রেজা নওফল হায়দার

তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়ি। বাবার চাকরির কারণে আমাদের সবাইকে এক বছর গ্রামে মানে নানা বাড়ি থাকতে হয়েছিল। বাংলাদেশের হাজার গ্রাম বলতে যে ছবি ভেসে উঠে মনের কল্পনায় ঠিক তেমনি একটি গ্রাম। আমি যখন স্কুলে যেতাম তখন বর্তমান রাস্তাটি ছিল একেবারে মাটির রাস্তা। কিছু অংশ আবার লাল ইটের পরিধি। কিন্তু বেশির ভাগ ছিল মাটির। ঋতুর পরিবর্তনে রাস্তাও তার আচরণ বদলাতো। আমরা দলবেধে স্কুলে যেতাম। যাওয়ার আসার সময়ে দূর থেকেই আমাদের চেনা যেত। মনে হতো এক দল গরু রাস্তা দিয়ে এলোমেলো করে চলছে। তোমরা নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাবছ। আসলে হয়েছে কি, মাটির রাস্তা, হাঁটার সময় কাছে ধুলো জমে যেত। তখন হাঁটার সময় প্রচুর ধুলো উড়ত। আর তাই মনে হতো এক দল গরুই হেঁটে আসছে। অন্য কিছু নয়। যদি বর্ষাকাল হতো তাহলে তো কথাই নেই। সারা শরীরে কাদা লেপটে থাকত। যখন বাড়ি ফিরে আসতাম তখন আম্মা বলত একমণ কাদা নিয়ে ফিরেছি।

যে গ্রামটিতে আমার শৈশব, সে গ্রামটিতে এক দল লোক বছরের দুটি সময়ে পলো দিয়ে মাছ ধরত। সে এক দারুণ উৎসব। আমি নিজে কখনও মামাদের সাথে হাঁড়ি নিয়ে সাথি হয়েছি। গাছে গাছে আম, কাঁঠাল ও জাম আরো কত কী। নিজেদের লাগানো কাঁঠাল গাছ থেকে পাকা কাঁঠাল নিয়ে এসে হই-হুল্লোড় করে খেয়েছি। বাড়ির পাশে খালের পানিতে গাছ থেকে লাফ দিয়ে স্রোতে ভেসে গেছি অনেক দূর। শীতকালে ঘন কুয়াশায় চুপচাপব সে অন্ধকার দেখতাম। তখন মনে হতো এই যেন কেউ আসবে ভয়ংকর ডাক দিয়ে। প্রায়ই শীতকালে আমাদের গ্রামে ষাঁড়ের লড়াই হতো। তখন মেলা বসত। বহুদূর থেকে শূকরের পাল নিয়ে আসত অচেনা মানুষেরা। আমরা ভয়ে সেদিন ঘর থেকে বের হতাম না। তাদের হাতে থাকা বিচিত্র লাঠি দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমায় শূকর চড়াতেন। গ্রামের কিছু মানুষদের দেখতাম তাদের কাছ থেকে মন্ত্র শিখছে। খুব খাতির-যত্ন করতেন তাদের। তখন আমরা খেজুর পাতার পাটিতে বসে কাঁচা আম পেড়ে বাগানে বসে সবাই মিলে খেতাম।

যাই হোক, যে স্কুলে পড়তাম ওটা তখন আমাদের সব থেকে কাছের স্কুল। প্রায় দুই কিলোমিটার পথ। তাই যেতে যেতে বহু মানুষ দেখতাম। তখন তো মটরসাইকেল কেউ রাস্তা দিয়ে চালালে সবাই বাড়ি থেকে বের হয়ে উঁকি দিয়ে দেখত। ওটা ছিল বিরল বাহন। বেশি চলত পায়ে প্যাডেল দেওয়া ভ্যানগাড়ি। ওটা চলত নিয়মিত। নৌকা ছিল সব থেকে আরামের। আমার কাছে তা বিশাল অ্যাডভেঞ্চার। আরো চলত গরুর গাড়ি।

আমাদের স্কুল ছিল প্রাইমারি স্কুল, প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। তখনও এটা সরকারি হয়নি। বিশাল টিনের ঘর। মাঝখানে কোনো দেয়াল ছিল না। আমরা যারা প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়তাম সবাই স্কুলের ধুলো জমা ফ্লোরে আনন্দে মিলেমিশে বসে পড়তাম। আমাদের গ্রাম থেকে দুইজন সিনিয়র ছিল দুইজনই আমাদের বড়ো আপু। তারা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত। উনারা শুধু হাই বেঞ্চে বসত। আসলে হয়েছে কী শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তেন যারা তারাই শুধু বেঞ্চে ক্লাস করতে পারতেন। আমরা উনাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতাম আর ভাবতাম কবে ওখানে বসব।

আমাদের স্যাররা ছিলেন সরল-সহজ। ছাত্রদের বাড়িতে যেতেন, খোঁজ নিতেন, ভালোবাসতেন। তারমধ্যে একজন স্যার ছিলেন, আমাদের বলতেন গাঁদা ফুলের গাছ লাগাতে, ফলের গাছ লাগাতে। আমরা স্যারের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে শুধু যে গাছের চারাই লাগাতাম তা কিন্তু নয়, এত বেশি মনোযোগী হয়েছিলাম যে, ডালপালা যে যেখানে গাছের যা পেত তাই মাটিতে পুঁতে সারাক্ষণ পরিচর্যা করতে থাকতাম। আমি তো আরো আগ্রহী হয়ে কলা গাছের ছালবাকল মাটিতে পুঁততে শুরু করলাম। আমার এইসব কাণ্ড দেখে আমার নানু হেসে গড়াগড়ি।

তারপর একদিন সব কাজ শেষ করে অদ্ভুত ভয় পেয়ে চুপচাপ বাড়িতে নানুর কোলের কাছে বসে থাকতাম। ব্যাপারটি হলো প্রায়ই নানু আমাদের সবার জন্য মুড়ি ভাসতেন। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। রাতের একটি সময়ে, সবার কাজ যখন শেষ, তখন শুরু হতো মুড়ি ভাজার কাজ। একটা কালো লম্বা মুখওয়ালা মাটির হাঁড়িতে গরম হতো বালি আর অন্য একটি হাঁড়িতে ভাজা হতো চাল। তারপর বিশেষ সময়ে ভাজা চাল ঢেলে দেওয়া হতো গরম বালি থাকা হাঁড়িতে। এরপর নানু সেই হাঁড়িটা বিশেষ কায়দায় নাড়াতেন, তারপর বের হয়ে আসতো মুড়ি। আর ছোটো খালা একটা ঝাঁঝড় সাদৃশ্য হাঁড়িতে পাটকাঠি দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকতেন। গরম মুড়ি পানির ফোয়ারার মতো কোনো এক জাদুর মন্ত্রে বের হয়ে আসত। আমার কাছে সব থেকে শিহরনের বা ভয়ের ছিল কালো লম্বা মুখের হাঁড়িটা। ওটা দিয়ে কেমন যেন অতিপ্রাকৃতিক আওয়াজ বের হতো। মনে হতো জাদুর হাঁড়ি।

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ খেলে যেত। সবুজ ধানের মাথায় বাতাস যখন খেলা করত তখন আমরা সবাই নেমে যেতাম মাঠে। মুখ লাগিয়ে কাঁচা ধানের মাথায় আদর দিতাম। যখন ধান পেকে সোনালি হয়ে যেত তখন মাঠ ভরা সোনালি রং। পাকা ধানের গন্ধে সারা গ্রাম ভরে যেত। তখনও মানুষ লাঙল দিয়ে জমি চাষ করতেন। আমাদের গ্রামে ধান মাড়াই করা হতো গরু দিয়ে। দিনভর গরু দিয়ে মলন মলানো হতো। সেই ধানের ঘ্রাণ যেন সুখ দিত মনে। কতবার ধানের খড়ের গাদার মধ্যে হারিয়ে গেছি। খড়ের গাদার উপড়ে উঠে দিতাম লাফ। গুছিয়ে রাখা গাদা আমাদের ভাড় সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ত। সন্ধ্যায় যখন পড়তে বসার আগে আম্মা হাতমুখ ধুতে নিয়ে গিয়ে দেখত ধারালো খড়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে কেটে গেছে তখন বকুনি দিত। শরীরের কেটে যাওয়া অংশে পানি লাগলেই খুব জ্বালা করত। কিন্তু দিন হলে সব ভুলে আবার আমরা মিলে যেতাম খেলায়, আনন্দে।

মাঘ মাসের নির্দিষ্ট দিনে আমাদের পাশের গ্রামে কবিগান হতো। গরম গরম মিষ্টি খাওয়া ও জিলাপির বিশেষ আয়োজন হতো। শীতের রাতে মামাদের হাত ধরে রাতে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা দোকানগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। তখন বড়ো আলো বলতে তিন ব্যাটারির টর্চলাইট ইয়া লম্বা আর হ্যাজাক লাইট। যারা অল্প পুঁজির দোকানদার তারা কুপি ব্যবহার করত। হ্যাজাক লাইটের উজ্জ্বল আলো তখন সবার মন কেড়ে নিত। আমার কাছে ভীষণ পছন্দের ছিল।

টিভিতে খেলা হলে আমরা সবাই দলবেধে টিভি দেখতে যেতাম। উঠানে বিশাল পাটি বিছিয়ে বসে পড়তাম। যেন কোনো উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি।

এমনি করে বছরের সময়গুলো কেটে যাচ্ছিল। তারপর বছরের শুরুতে বাবা এসে সব বাঁধন আর কল্পনার রাজ্যের প্রিয় গ্রাম থেকে নিয়ে গেলেন আবার ঢাকায়। শুরু হলো আবার নতুন জীবনের খেলা। ■

সিনিয়র সাংবাদিক, ছোটো গল্প লেখক। সম্পাদক- সময় প্রতিদিন টুয়েন্টি ফোর

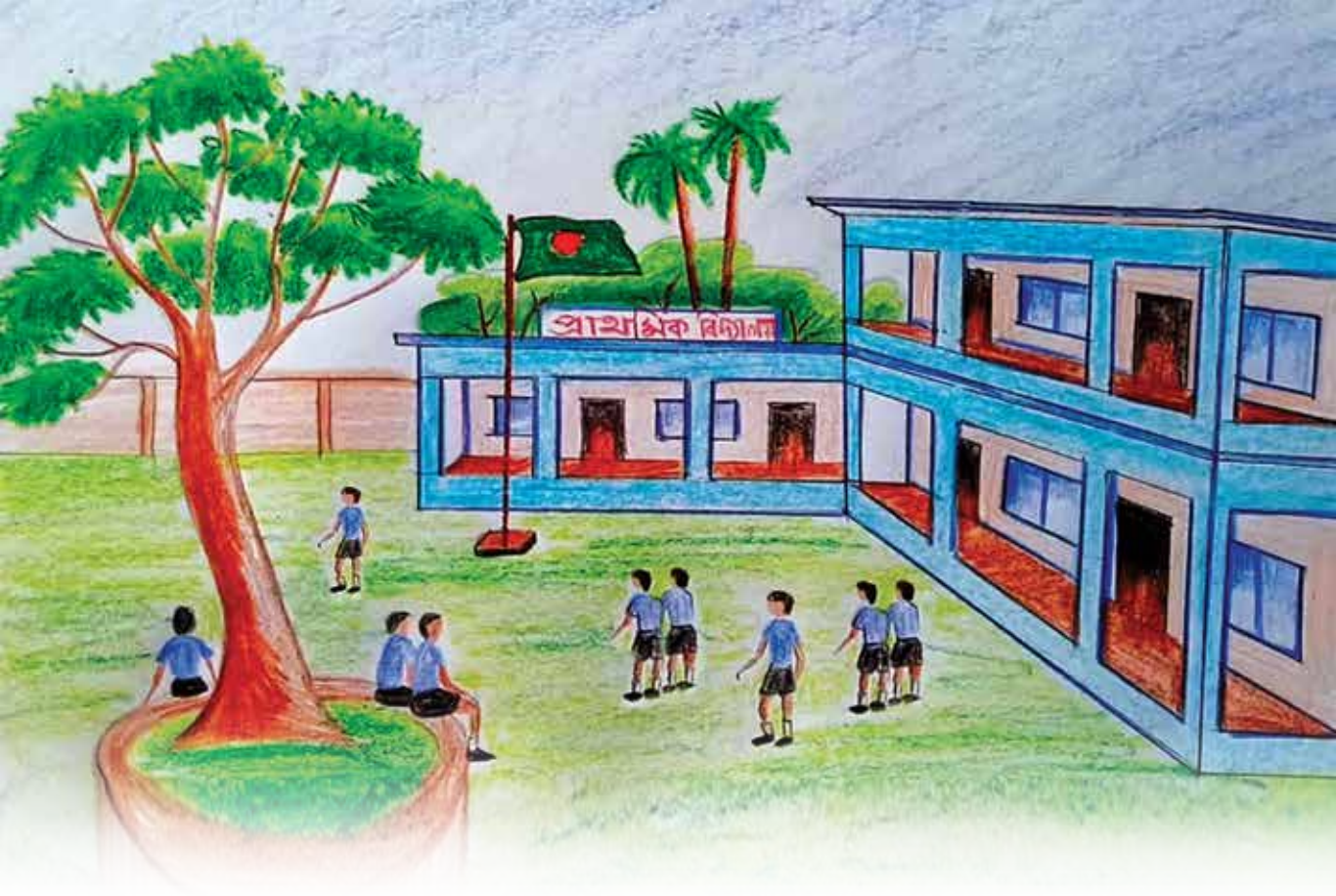

স্কুলে থেক আনন্দের বাগান

মৃত্যুঞ্জয় রায়

ছোট্ট বন্ধুরা- গণিত, ইংরেজি, ফিজিক্স, রসায়ন এসব তো অনেক বড়ো বিষয়, কিন্তু কখনো কি প্রকৃতি আর গাছপালা নিয়ে ভেবেছ? প্রকৃতির জগৎটা কত বিশাল, ভেবেছ তা? হয়ত তোমরা গণিত, ইংরেজি, ফিজিক্স, রসায়ন- এসব ছাড়াও বাঁচতে পারবে। পৃথিবীর সব মানুষ কি এসব পড়ে? তারা কি বেঁচে নেই? কিন্তু গাছপালা ছাড়া তুমি কী করে বাঁচবে? তোমরা কি কখনো ভেবেছ, যা খাও সেগুলো আসে কোথা থেকে? খাবার ছাড়া কি বাঁচবে? কিংবা অক্সিজেন? বন্ধুরা এ সবই দিচ্ছে আমাদের চারপাশে থাকা গাছপালা। গাছপালা কম থাকলে আমাদের প্রত্যেককে হয়ত পিঠে স্কুল ব্যাগের মতো একটা করে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে সারাক্ষণ চলতে ফিরতে হতো। আর না থাকলে আমরা মরেই যেতাম পৃথিবীতে কোনো জীবন থাকত না। তাই এসো, যারা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সাথে আজ আমরা বন্ধুত্ব করে নিই, তাদের আজ থেকে ডাকি গাছবন্ধু বলে।

বন্ধুদের সাথে তোমরা কী করো? নিশ্চয়ই গল্প করো, বেড়াও, গিফট দাও- তাই না? গাছদের সাথেও বন্ধুত্ব করে দেখো। দেখবে ওরাও তোমাদের অনেক গিফট দেবে। জানতে চাও কী গিফট তোমরা গাছের কাছ থেকে পেতে পারো? যদি ফল গাছকে বন্ধু করো, দেখবে ওরা তোমাকে টাটকা ফল খাওয়াচ্ছে- আহা, কী সুস্বাদু ফল! যেমন স্বাদ- তেমনি পুষ্টিকর। রোজ যদি একটা যে-কোনো ফল খেতে পারো, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি- তোমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, ডাক্তারদের কাছে খুব একটা যেতে হবে না।

আর শাকসবজির কথা কী বলব, ওগুলো তো পুষ্টির ডিনামাইট। নিজের হাতে ফলানো শাকসবজির স্বাদই

আলাদা। ফ্রেশ, তরতাজা শাকসবজি রোজ কিছুটা হলেও খাবে- দেখবে এতে তোমাদের আর চশমা পড়তে হবে না, গালে-মুখে ঘা হবে না, পেটের গণ্ডগোল কমে যাবে আর টিচাররা প্রশ্ন করলেই ঝটপট উত্তর দিতে পারবে। আর বন্ধুদের বাসায় কিছু শাকসবজি দিয়ে বন্ধুত্বকে গভীর করতে পারবে।

ফুল আর বাহারি গাছের কথা কী আর বলব? ওগুলো তো খাওয়া যাবে না, পুষ্টিও দেবে না। কিন্তু বাগানে ফুল ফোটানোর যে আনন্দ তা তুমি পৃথিবীর আর কিছুতেই পাবে না। কিছু গাছ আছে, হাতের কাছে থাকলে চট করে তার সাহায্য নেওয়া যায়। এই যেমন হঠাৎ আঙুলটা কেটে গেল। তুমি কয়েকটা গাঁদা ফুলের পাতা ডলে রস করে কাটা জায়গায় লাগিয়ে দাও না, দেখবে কাটা জায়গা জোড়া লেগে গেছে, ব্যথাও নেই। হঠাৎ মৌমাছি হুল ফুটিয়ে দিল, পিঁপড়ের কামড়ে জ্বালা করছে- তুমি কয়েকটা তুলসি বা নয়নতারা ফুল গাছের পাতার রস সেখানে লাগিয়ে দাও- দেখবে এক নিমিষেই জ্বালাটা সেরে যাবে। এগুলোকে আমরা বলি ঔষধি গাছ।

তাই আজ থেকে এসো-আমরা সবাই গাছপালাকে ভালোবাসতে শুরু করি। কিছু গাছকে চিনে ওদের বন্ধু করে নিই। কীভাবে সেটা শুরু করা যায় বলো তো? স্কুলে পড়ার সময় পথের ধারে আমি একদিন একটা জামের চারা দেখে সেটা তুলে এনে লাগিয়েছিলাম। তখন তোমাদের মতোই আমি সেই স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম। চারাটা লাগানোর পর রোজ স্কুলে গিয়ে দেখতাম, ওটা বেঁচে আছে কিনা। গোড়ায় মাঝে মাঝে টিউবওয়েল থেকে গ্লাস ভরে জল দিতাম। স্কুল ছেড়ে চলে আসার সময় দেখি গাছটা আমার চেয়েও লম্বা হয়ে গেছে। প্রায় ত্রিশ বছর পর সেই স্কুলের পুনর্মিলনীতে গিয়ে আমি সহপাঠী বন্ধুদের আগে ওই গাছটাকে খোঁজার চেষ্টা করি। স্কুল প্রাঙ্গণে বিশাল মহীরুহ সেই জামগাছ। সেই গাছটা যত বড়ো হয়েছে, আমি তত বড়ো হতে পারিনি। ওই গাছটার মতো প্রকৃতি ও পরিবেশের কল্যাণে আমি কোনো অবদান রাখতে পারিনি। একটা গাছের কাছে আমার সারাটা জীবন যেন তখন ছোটো হয়ে গেল। গাছটাকে দেখে আমি একসাথে যেন শতবন্ধু দেখার আনন্দ পেয়েছিলাম।

তোমরা কি আমার মতো সেই আনন্দটা পেতে চাও? তাহলে আজ থেকে তোমরা প্রত্যেকে একটা করে গাছ লাগানোর কথা ভাবতে পারো। তোমার লাগানো গাছ বড়ো হয়ে যখন মানুষ আর পাখিকে ফল দেবে, ফুলের শোভায় চারপাশ আলোকিত করে তুলবে- তখন কারো মুখ থেকে হয়ত আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়বে- ওয়াও! পৃথিবীটা এত সুন্দর!

কি, রাজি আছ তোমরা? হয়ত ভাবছ, কী গাছ লাগাবো আমরা? আমি তোমাদের কি বলে দেবো কিছু গাছের নাম? জারুল, কৃষ্ণচূড়া, কনকচূড়া, কদম, নাগেশ্বর, নিম- এগুলো লাগাতে পারো। কিছু ছোটো ফুলের গাছ যেমন রঙন, জবা, গন্ধরাজ, টগর, রাধাচূড়া, কামিনি, কুরচি, বাগানবিলাস, ঝুমকোলতা, মধুমঞ্জরী, অলকানন্দা এসব গাছও তোমরা লাগাতে পারো। পুষ্টিকর আর নিরাপদ শাকসবজি খেতে চাইলে নিজেরা তা ফলাতে পারো তোমরা ছোটো ছোটো গ্রুপ করে একটা করে পুষ্টিবাগান গড়ে তুলবে। টিচাররা তোমাদের গাইড করবেন আশা করি। জায়গা কম থাকলে, পাঁচটা ক্লাসের পাঁচটা গ্রুপে পাঁচটি সবজি বেড়ে পাঁচ রকমের শাকসবজি লাগাতে পারো। শাকসবজি লাগানোর বেলায় মৌসুমটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখন বর্ষাকাল এ সময় তোমরা লাগাতে পারো পুঁইশাক, গিমাকলমি, ঢেঁড়শ, লালশাক, ডাঁটা ইত্যাদি। কয়েকটা জাংলা করে মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, ঝিঙার বিচি পুঁতে সেসব গাছ জাংলায় উঠিয়ে দিতে পারো। শীতকালে তো কথাই নেই- ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাল বাঁধাকপি, চীনা বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, টমেটো, গাজর, পালংশাক, লেটুস- এ রকম শত শাকসবজি দিয়ে তোমরা স্কুলের বাগান সাজাতে পারো। মনে রেখো, এই বাগান করার মধ্যেও কিন্তু একটা আর্ট

আছে। বাগানের নকশা ও বেড তৈরির সময় তোমরা তা মাথায় রাখতে পারো। এসব বাগানের শাকসবজি তুলে মাঝে মাঝে তোমরা এক একটা গ্রুপ থেকে ছোটোখাটো বনভোজনের আয়োজন করতে পারো, দাওয়াত দিতে পারো টিচারদের, অন্য গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদেরও। অন্তত কচি সতেজ লেটুস পাতা তুলে স্যান্ডউইচ বা বার্গারের সাথেও তো খেতে পারো।

স্কুলে বাগান করে সত্যিই যদি তোমরা আনন্দ পাও, ভালো লাগে- তাহলে সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান দিয়ে এরপর প্রত্যেকের বাড়িতে এ রকম বাগান গড়ে তোলো। বাড়ির আঙিনায় জমি থাকলে তো কথাই নেই, না হলে ছাদে বাগান করতে পারো। ওসব করা সম্ভব না হলে বারান্দা বা ঘরের ভেতরেও কিছু গাছ টবে লাগাতে পারো। দেখবে, এতে তোমার মা-বাবারা কত্ত খুশি হবে। তোমার ভাইবোনরাও দেখবে একদিন তোমার সাথে বাগানে কাজ করছে। সারাদিন পড়াশুনার ফাঁকে বাগান করার নির্মল আনন্দই শুধু তোমরা এতে পাবে না, কাজ করার জন্য তোমাদের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। জানোই তো, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তাই তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ- অলস বসে সময় নষ্ট করবে না, সময়টাকে কাজে লাগাও। তাই সময়কে হেলাফেলা করে নষ্ট করো না। এখন এই সাবজেক্ট পড়তে ভালো লাগছে না তো অন্য সাবজেক্ট নিয়ে বসো, এখন এ কাজ ভালো লাগছে না তো অন্য কাজ করতে শুরু করো- দেখবে একঘেঁয়েমিটা কেটে যাবে। বাগান করলে সেই আনন্দটা আরো বেশি পাবে। স্কুলে বাগান করো, স্কুলটাকে তোমরা একটা আনন্দের স্কুলে পরিণত করো। স্কুল বাগানের তোমরাই তো এক একটা সুন্দর ফুল। তোমাদের সেই ফুলের শোভা ও সৌরভ ছড়িয়ে দাও স্কুল থেকে বাড়িতে, সমাজে-প্রকৃতিতে। আমাদের অপরূপ বাংলাদেশ সবুজ-শ্যামল ও সুন্দর হয়ে উঠুক তোমাদের হাতে। ■

প্রাবন্ধিক

প্রকৃতি

জাওয়াদুল ইসলাম ভুঁইয়া

আজ এই বনে মাতে কোন রণে
লক্ষণ তাই কয়
প্রকৃতি ভীত, আকুতি তার
রক্ষণ নাই হয়।

আসমানে আজ জমেছে আঁধার
আলোক খুঁজে না পায়
অরুণ-চন্দ্র আতঙ্কে আজ
আড়ালে লুকিয়ে রয়।
পবন তাহার আগমন দিয়ে
ঘোষিয়াছে রণবাণী
জীবকুল আজ তটস্থ সবে
হবে কোন হানাহানি।

সমুদ্র আজ ভারি উত্তাল
তরঙ্গ রাশি রাশি
জেলেদের দল পার হয়ে জল
ডাঙায় ফিরিয়া আসি।

কপোলে চিন্তা রেখা এঁকে চাষি
বাড়ি ফেরে তড়িঘড়ি
ধানক্ষেত মোর ঝড়েই কবর
যার পিছে খেটে মরি।

দমকা হাওয়ায় চমকে উঠে
বজ্র আঘাত হানে
ডালিম গাছটি লুটিয়ে পড়ে
তীক্ষ্ণ উজল বাণে।

প্রকৃতি মোরে দিয়েছে জীবন
প্রতিকূল অনুকূলেই
সহায় যে তার হইব কী আর
তারই সহায়ে রই।

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূব প্রকাশিতের পর দশম পর্ব]

অপারেশন রায়পুর

হাজি চাচার মেহগনি বাগানে আমাদের পুরো দিন কাটল। যোদ্ধাদের আরাম-আয়েশ করতে নেই জেনেও ওইদিন আমরা বেশ লম্বা ঘুম দিলাম। কারণ, সবাই বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আয়াপুর অপারেশনের সময় পুরোটা রাত জাগতে হয়েছে, সেই সাথে ছিল গভীর টেনশন। তাই হাজি চাচার দেওয়া ভূরিভোজে শরীর এলিয়ে পড়েছিল। তবে ঘুমের সময়টায় হাজি চাচা তার নিজস্ব লোক দিয়ে পাহারা বসিয়েছিলেন চারদিকে, যাতে কোনো বিপদের আভাস পেলেই আগেভাগে আমাদের জাগিয়ে দিতে পারে। যাহোক, কোনো বিপদ হয়নি। আমরাও জানতাম– ভিতু রাজাকাররা এদিকে আসার সাহসই পাবে না। তাছাড়া জমির ভাইয়ের বাহিনী যেভাবে আক্রমণ চালিয়ে রাজাকারদের নিকেশ করছে তাতে রতনপুর থানা সদরের বাইরে বের হতে খুব একটা সাহস পাচ্ছে না তারা। বারবার বিভিন্ন ব্রিজ-কালভার্ট উড়িয়ে দেওয়ার কারণে আর্মিরাও থানা সদরের দিকে আসতে কিছুটা দ্বিধায় আছে। শালবরাট-রামকান্তপুর মোড়ের কালভার্টটা ইতোমধ্যেই মেরামত হয়েছে বলে তারা খাজুরা-রায়পুর-রতনপুর রোডে চলাচল করছে, বিভিন্ন রাজাকার ক্যাম্পে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ দিচ্ছে। বলদেঘাটা ব্রিজও দু-একদিনের মধ্যে মেরামত হয়ে যাবে। তখন তাদের যাতায়াতে

আরোও সুবিধে হবে। যশোর-নড়াইল রোড খোলা থাকলেও এই পথ একটু ঘোরানো। তাছাড়া আয়াপুর অপারেশনের পর এ পথও তাদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তারা এখন খুব সচেতন– প্রতিটি ব্রিজ-কালভার্টের কাছে ক্যাম্প করে পাহারা বসিয়েছে। সেসব ক্যাম্পে আর্মি-রাজাকার দুই-ই থাকছে।

মেহগনি বাগানে আমাদের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে বিকেল পাঁচটা হয়ে যায়। পাশে তাকিয়ে দেখি হাজি চাচা বসে আছেন চেয়ারে। তার নির্দেশে কুদ্দুসরা চা-নাশতা গোছাচ্ছে আমাদের জন্য। চা-নাশতা খেতে খেতে আর হাজি চাচার সাথে যুদ্ধের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করতে করতে অন্ধকার ঘোর হয়ে আসে। হাজি চাচা মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা আরো ঘণ্টাখানেক পর, অন্ধকার গাঢ় হলে বিলপথে রওনা দিলাম আমাদের আস্তানার দিকে।

আস্তানায় পৌঁছেই অবাক হয়ে দেখি জমির ভাইয়ের বিশ্বস্ত সঙ্গী ও দূত লায়ন দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে খুশিতে লেজ নাড়াতে থাকে। মুখে অবিরাম কুঁইকুঁই শব্দ। আমি জিজ্ঞেস করি– কী রে লায়ন, খবর কী? ভালো আছিস?

একটা অবলা জানোয়ার– কুকুর কী জবাব দেবে! সে যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে কুঁইকুঁই করে কী যেন বলতে চায়। তারপর হঠাৎ সে মাটিতে শুয়ে পড়ে। তখনই দেখা যায় তার পেটের নিচে কালো সুতো দিয়ে কী যেন বাঁধা। আমি দ্রুত সুতো ছিঁড়ে সেটি হাতে নিই। ঘন কালো লোমের জঙ্গলে কালো সুতো, কারো চোখে পড়বার উপায় নেই। আমি সেটি হাতে নিয়ে দেখি একটি মোড়ানো কাগজ, তাতে বেশ ক' লাইনের চিঠি। কাগজের বাইরের দিকটা কালো রঙে ছোপানো– কালোর সাথে কালোর মিশেল, ভারি চমৎকার ছদ্মবেশ! আমি ভাবি– এমন না হলে কী জমির ভাই এত বড়ো কমান্ডার! তিনি গুপ্তচর দিয়েও চিঠিটি পাঠাতে পারতেন, কিন্তু তা হতো গতানুগতিক– কোনো থ্রিল থাকত না; অথবা এমনও হতে পারে– গুপ্তচরের নিরাপত্তার বিষয়টাও তিনি বড়ো করে দেখেছেন।

যাহোক, আমি দ্রুত জমির ভাইয়ের চিঠি পড়ি। তিনি লিখেছেন: 'পাকি আর্মি আর রাজাকারেরা খাজুরা-রায়পুর রুটে চলাচল বাড়িয়ে দিয়েছে। এ অঞ্চলে অত্যাচারও বাড়িয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে রায়পুর রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকারেরা মানুষের বাড়িঘর লুট করছে, স্বাধীনতার পক্ষের লোক সন্দেহে নিরীহ মানুষজনকে হত্যা করছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আজ রাতেই রায়পুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করব। তোমার বাহিনীও সাথে থাকবে। তুমি তোমার বিচ্ছুদের নিয়ে রাত দশটার মধ্যেই বিল জলেশ্বরের উঁচু টিলা খড়েলমাঠের খেজুর বাগানে অবস্থান নেবে। আমিও আসছি আমার বাহিনী নিয়ে।'

আমি সবাইকে বললাম চিঠির কথা। কাসেদও আছে সেখানে। সে আমার দিকে তাকায় নির্দেশনা পাওয়ার আশায়। আমি সবার সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে মোটামুটি একটা কর্মপন্থা ঠিক করি– আর এক ঘণ্টা পরে আমরা খড়েলমাঠের দিকে যাত্রা করব। তার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। আস্তানায় খাবার রেডিই ছিল– বাবুর্চি রেঁধে রেখেছে। দাদুরা, এখানে একটা কথা তোমাদের বলা দরকার, তা হলো: সুঁড়ো ও শুকদেবপুর গ্রাম দুটি হিন্দুপ্রধান। আগেই বলেছি– এ গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই হানাদারদের ভয়ে ভারতে পালিয়ে গেছে। যারা আছে তারা সবাই বয়স্ক বুড়োবুড়ি। তাই এই দুটি গ্রামে মানুষের বাড়িতে থাকা যাচ্ছে, কিন্তু খাওয়ার সুযোগ নেই। তাই এখানে অবস্থানকালে আমরা নিজেদের ব্যবস্থায় রান্না ও খাওয়া-দাওয়া করেছি। অবশ্য অন্যান্য প্রায় সব স্থানের গ্রামবাসীরাই আমাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করেছে।

আমরা ঝটপট ভাত খেয়ে নিই। লায়নকেও যথাযথভাবে আপ্যায়ন করা হলো। আমি কাসেদকে বললাম– এবার বোধহয় তোমার গাড়িতে অস্ত্র বহনের দরকার হবে না। কারণ জমির ভাইয়ের বাহিনীর কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্র থাকবে– এটা ভাবাই যায়। আমরা যতটা সম্ভব বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ নিজেদের সাথে বহন করব। সুতরাং এবার তোমার ছুটি মাই ডিয়ার কাসেদ।

আমরা যথাসময়ে খড়েলমাঠে পৌঁছি। এটি বিল

জলেশ্বরের গভীর অংশের পুবে বেশ উঁচুমতো একটা জায়গা– চারপাশের জমির চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু। জায়গাটা উঁচু বলে এখানে প্রায় দু'বিঘে মতো জায়গায় একটা বিশাল খেজুর বাগান। চারদিকে ধানের ক্ষেত, তার মাঝে এই খেজুর বাগান, দূর থেকে ভারি সুন্দর দেখায়। এখন অবশ্য জল থইথই 'অথৈ সাগর,' বিল জলেশ্বর আগের মতো গভীর নেই, অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে পানিও কম; তবে খড়েলমাঠ আগের মতোই আছে। সেখানে এখন ছোটো আকারের হলেও একটা খেজুর বাগান আছে, কর্মক্লান্ত চাষিদের বিশ্রামের জন্য আছে একটি ছাপড়া ও একটি টিউবওয়েল। আগে একটি বরই গাছও ছিল, এখন নেই।

আমরা খেজুর বাগানে পৌঁছানোর মিনিট দশেক পরেই জমির ভাই তার বাহিনী নিয়ে সেখানে এলেন। দিন পর তার সাথে দেখা। মনটা খুশিতে ভরে যায়। কিন্তু যোদ্ধাদের আবেগপ্রবণ হওয়া মানায় না বলে সে খুশি প্রকাশ করি না। তবে জমির ভাই করলেন। তিনি আমার পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন– 'ওয়েল ডান মাই ডিয়ার ইয়াং ফ্রেন্ড।' শুধু এটুকু, সাথে তার সেই চিরচেনা মিষ্টি হাসি। এতেই তার গভীর ভালোবাসাপূর্ণ আবেগ এত চমৎকারভাবে প্রকাশ পেল যে, আমার কান্না চলে আসে, কিন্তু তা প্রকাশ করি না। তার সাথে এসেছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। জমির ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন– ইনি অবসরপ্রাপ্ত স্কুল মাস্টার আনোয়ারুল ইসলাম– আমাদের উপদেষ্টা ও

অভিভাবক। কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে তিনি তার সহজ সমাধান দেন। আমাদের সাহায্য করেন নানাভাবে।

রায়পুর অপারেশনের সমস্ত খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমাদের ব্রিফ করলেন জমির ভাই। ঠিক হলো রাত সোয়া তিনটায় আমরা রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করব। এলএমজি, এসএমজি, রাইফেল এবং গ্রেনেড নিয়ে সাঁড়াশি আক্রমণ চলবে। ভোরের আগেই অপারেশন শেষ করতে হবে।

রায়পুর রাজাকার ক্যাম্প অপারেশন ছিল কমান্ডার জমির ভাইয়ের এগারোতম অপারেশন। তার কাছে খবর ছিল– সেখানকার রাজাকারেরা মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবিলার জন্য বড়ো ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রায় মাসখানেক ধরে রতনপুর ও শালিখা থানা এবং যশোর সদরের উত্তর ও পূর্বাংশের বিশাল এলাকাজুড়ে মুক্তিবাহিনীর হামলা বড্ড বেড়ে গেছে। প্রায় জায়গাতেই হানাদার পাকিস্তানি সেনারা আর রাজাকারেরা ভালো রকম মার খাচ্ছে– যশোরের আঞ্চলিক ভাষায় যাকে বলে প্যাদানি। ইন্দ্রা, শ্রীরামপুর, জয়পুর, শতপাড়া, ক্ষেত্রপালাসহ একটা বিরাট এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা দিনের বেলায় স্বাচ্ছন্দে ঘোরাঘুরি করে। গ্রামের মানুষের বাড়িঘর তাদের নিরাপদ আস্তানা, সেখানেই তাদের খাওয়াদাওয়া। বিভিন্ন গ্রামের মানুষ চাল-ডাল, তরিতরকারি একত্র করে মুক্তিযোদ্ধাদের খেতে দিচ্ছে দিনের পর দিন। দেশের প্রতি আর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সাধারণ মানুষের এই ভালোবাসা ও মমতার কোনো তুলনা হয় না–এ নিয়ে জমির ভাই যত ভাবেন, ততই কৃতজ্ঞতায় তার দু'চোখ ভরে যায় পানিতে। আমার অবস্থাও তাই।

মুক্তিবাহিনীর অবস্থান যত মজবুত হচ্ছে, রাজাকার বাহিনী ততই হতাশ আর বেশামাল হয়ে পড়ছে। মুক্তিবাহিনীর সাঁড়াশি হামলা মোকাবিলা করতে না পারার কারণে স্থানীয় শান্তি কমিটি আর রাজাকারের গড-ফাদারদের খুবই লজ্জিত হতে হচ্ছে ওপর মহলে। মান-ইজ্জতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে রীতিমতো। তাইতো ওরা এবার সাঁড়াশি হামলা চালাতে চায় বিচ্ছু মুক্তিদের ওপর। আর ওইসব গ্রামের বিশেষ করে নলডাঙ্গা-ভাতুড়ের মানুষদেরও

উচিত শিক্ষা দিতে চায়। ওরা 'ভারতের চর' মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় ও খাবার দিয়ে যে অন্যায় আর গোনাহর কাজ করেছে, তার জন্য ওদের চরম মূল্য দিতে হবে– রায়পুর রাজাকার ক্যাম্পের হোমরাচোমরা রাজাকার আর শান্তি কমিটির নেতারা এসব কথা আস্ফালন করে বলে। তাদের এসব কথাও জমির ভাইদের কানে চলে যায় সময়মতো।

শেষমেস জমির ভাই সহযোদ্ধাদের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– অন্য অপারেশন বাদ দিয়ে অচিরেই রায়পুর রাজাকার-ক্যাম্প আক্রমণ করে ওদের খতম করে দিতে হবে। তা না হলে অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে তারা যে বিশাল মুক্ত এলাকা গড়ে তুলেছেন, তা টিকিয়ে রাখা যাবে না। এসব গ্রামের হাজার হাজার নিরীহ দেশপ্রেমিক মানুষদেরও রাজাকার আর পাকি হায়েনাদের থাবা থেকে বাঁচানো যাবে না। তাই রায়পুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণের এই প্রোগ্রাম। জমির ভাই আশঙ্কা করছিলেন, বেশি দেরি করলে বেশি সংখ্যক আর্মি খাজুরা হয়ে রায়পুর ও আশপাশের এলাকায় আসবে। এতে রাজাকারদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। তখন ওদের হটানো মুশকিল হয়ে পড়বে। জমির ভাইয়ের এক কথা তা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। আমরা ওদের ভালোমতো ঘায়েল করতে পারলে এদিকে আর ঘাঁটি গাড়তে পারবে না। আমরা তখন পুরো যাদবপুর-বন্দবিলা পর্যন্ত মুক্ত এলাকা বানিয়ে ফেলব।

জমির ভাইয়ের এই পরিকল্পনা ও স্বপ্নের কথা সবাই মন দিয়ে শোনে। কমান্ডার যুদ্ধের খুঁটিনাটি ও কলাকৌশল সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এরই মাঝে জমির ভাই আচমকা আমাকে কাছে ডেকে বললেন–বাবু, আমাদের এবারের যুদ্ধটা বেশ কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, দুজন গুপ্তচর আজ খবর এনেছে– শত্রুর অবস্থানটা বেশ সুরক্ষিত। ওরা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। অস্ত্র-গোলাবারুদও বেশি। তাই সরাসরি ক্যাম্প আক্রমণ করব নাকি অন্য কোনো কৌশলের আশ্রয় নেব, সে বিষয়ে চিন্তা হচ্ছে খুব। এমন চিন্তা এর আগে কখনো হয়নি।

কমান্ডারের কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে যাই– এমন দোমনা ভাব তার মধ্যে তো কখনো দেখিনি! অন্য মুক্তিযোদ্ধারাও কেমন দ্বিধায় পড়ে যায়। তখন আমি বলি–জমির ভাই, আপনার চিন্তাটা খুবই যুক্তিসংগত। তবে একটা কৌশল করা যায়...

– কী কৌশল? খুলে বলো, বাবু।

– আমরা আমাদের পরিকল্পনা মতো আজই যথাসময়ে আক্রমণ করব, কিন্তু সে-আক্রমণ হবে ডামি আক্রমণ...

–ডামি আক্রমণ! বুঝিয়ে বলো, ডিয়ার বাবু।

–আমরা আচমকা রায়পুর রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করব, কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে অবস্থান করব না। আমাদের হামলার জবাবে শত্রুরা পাল্টা গুলি চালানো শুরু করলে আস্তে আস্তে আমরা থেমে যাব এবং পিছু হটব। তারপর গুপ্তচর দিয়ে রটিয়ে দিতে হবে যে, রাজাকারদের আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে মুক্তিরা পালিয়ে গেছে। তারপর সুযোগ বুঝে ভিন্ন কৌশলে ওদের ঘায়েল করতে হবে। কোনোভাবে ক্যাম্প থেকে ওদের বের করতে পারলেই...

আমার কথা শেষ না হতেই জমির ভাই বলেন– বাবুর প্রস্তাবটা যুক্তিসংগত– আগেও আমরা হাগড়া আর ঠাকুরকাঠিতে দুটো অপারেশনে এমন কৌশলগত পিছু হটার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু এবারের বিষয়টা আলাদা। আমাদের প্রথম আস্তানা ধলগ্রামের আমবাগানে হলেও এখন সময়ের ব্যবধানে পুরো রতনপুর এলাকাই আমাদের আস্তানা– বনজঙ্গল আর মানুষের ঘরবাড়িই আমাদের দুর্গ। ধলগ্রাম থেকে বন্দবিলা-খাজুরা-ভদ্রবিলা, কয়ালখালি থেকে নারিকেলবাড়িয়া, শতপাড়া থেকে মাহমুদপুর-ছাতিয়ানতলা-সুঁড়ো-শুকদেবপুর-দিয়াড়া- নলডাঙ্গা-ভাতুড়ে- শ্রীরামপুর- ইন্দ্রা- মালঞ্চি- সদুল্লোপুর-শেখেরবাথান-শালবরাট-রামকান্তপুর-পাইকপাড়া-রতনপুর– এই বিশাল এলাকায় আমার বাহিনী আর বাবুর রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর অনেকগুলো হামলা হয়েছে। সর্বত্রই রাজাকার বাহিনী পরাজিত হয়েছে। আমাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি হলেও ওদের ক্ষতি বিপুল। এসব গ্রামের মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ– তারাই তাদের বাড়িঘরে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছে; খাদ্য-খাবারের

যোগান দিচ্ছে, এ কথা রাজাকারেরা খুব ভালো করেই জানে। তাই আমরা এখান থেকে হঠাৎ পালিয়ে গেলে গ্রামের সাধারণ মানুষদের অবস্থা কী হবে, তা কি ভেবে দেখেছ কেউ? তাদের এভাবে রেখে আমরা পালিয়ে যেতে পারি না।

মাস্টার আনোয়ারুল ইসলাম এতক্ষণ চুপ ছিলেন– কোনো কথা বলেননি, শুধু শুনেছেন। এবার তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: তোমরা পালিয়ে যাবা আবার যাবা না। আমাদের ইয়াং ফ্রেন্ড বাবুর কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছে– আমরা হঠাৎ আক্রমণ করেই পিছু হটব। তারপর নলডাঙ্গার শেখদের যে বিরাট মেহগনি বাগান আছে, তার মধ্যে তোমরা লুকিয়ে থাকবা। এদিকে রটিয়ে দেওয়া হবে যে, মুক্তিরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে এই এলাকা থেকে। তখন রাজাকারেরা যে আনন্দ আর উল্লাস করবে তা আমি দিব্যচোখে এখনি দেখতে পাচ্ছি। দিনের আলোয় তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে আশপাশের গ্রামগুলোর ওপর। বিশেষ করে নলডাঙ্গার শেখপাড়ার ওপর তাদের নজর বেশ আগে থেকে। এই গ্রামের সব মানুষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের। তবুও এতদিন কেন যে ওরা ওদের কাছের এই গ্রাম আক্রমণ করে হত্যাকাণ্ড আর লুটপাট চালায়নি, তা আমার কাছে এক রহস্য। কিন্তু এবার করবে। মুক্তিরা পালিয়ে গেছে এই আনন্দে তারা আত্মহারা হয়ে যাবে এবং এই গ্রামের সম্পদশালী মানুষদের ঘরবাড়ি লুট করবে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে– এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো। আর এই লুটপাটের সময়ই হবে আসল খেলা।

–কীভাবে? জমির ভাই টেনশনের সাথে জিজ্ঞেস করেন।

মাস্টার সাহেব এবার বলেন– ওয়েট, মাই বয়... ওয়েট...

দাদুরা, মাস্টার সাহেব সম্পর্কে আমি আরো কয়েকটি কথা বলতে চাই। তার বয়স প্রায় আশি বছর। তবে তার বলিষ্ঠ আর সুঠাম দেহ দেখে মনে হয়, তিনি এখনো ষাট-পঁয়ষট্টির কোঠায় আছেন। এলাকার সম্মানিত মানুষ তিনি। কোনো ঝুট-ঝামেলায় নেই। নিপাট সাদাসিধে আর সজ্জন বলতে যা বোঝায়, মাস্টার আনোয়ারুল ইসলাম তাই। তবে বাইরে তিনি যতই সাদাসিধে হন না কেন, তার ভেতরে দেশপ্রেমের আগুন দাউদাউ জ্বলে। তাইতো তিনি অত্যন্ত গোপনে এলাকায় 'মুক্তিযোদ্ধা সাহায্য কমিটি' গঠন করেছেন। আশপাশের সব গ্রামেই তার ছাত্ররা, ছাত্রদের ছাত্ররা রয়েছে। সবাই তাকে বাবার মতো সম্মান করে। তারাই মাস্টার সাহেবের 'মুক্তিযোদ্ধা সাহায্য কমিটি'র সদস্য। এই কমিটির সদস্যরাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার সংগ্রহ করে, থাকার ব্যবস্থা করে।

এভাবে গ্রামের মানুষগুলো খুশি মনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। এমনও হয়েছে– ভাতুড়ে গ্রামের এক থুরথুরে বুড়িমা মাঝে মাঝে শুধু পোড়া বেগুনভর্তা আর এক থালা গরম ভাত পাঠান জমির ভাইয়ের জন্য। জমির ভাই সেই ভর্তা বেগুন আর গরম ভাত খান মন-প্রাণ ভরে।

জমির ভাইয়ের কাছে শুনেছি– ওই বুড়িমার সাথে তার হঠাৎ করেই পরিচয় হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে, এক অপারেশন চালানোর সময়। অপারেশন শেষ করে শেষ রাতে ওই বুড়িমার অতিথি হয়েছিলেন তিনি। অন্যদেরও বিভিন্ন বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। জমির ভাইকে বুড়িমা-ই বলেছেন তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য। বলেছেন বটে, তবে খাওয়াবেন কী! তিনি গরিব মানুষ। ভালো কিছু ঘরে নেই। কী খাওয়াবেন ছেলেটাকে– এমন চিন্তা করছেন বুড়িমা। তা দেখে জমির ভাই রান্নাঘরে ঢুকে যান। হাঁড়িতে কড়কড়ে ভাত আর একটা সানকিতে খানিকটা বেগুনভর্তা দেখে তিনি আনন্দে চেঁচিয়ে বলেন– মা, এই বেগুনভর্তা দিয়েই আমি ভাত খাব। আর কিছু আমি ছোঁবোই না। আহা রে! কতদিন বেগুনভর্তা দিয়ে ভাত খাই না। মা, তুমি এক্ষুনি আমাকে খেতে দাও। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।

ভাত খেয়ে জমির ভাই বুড়িমার বেগুনভর্তার এমন তারিফ করেছিলেন যে, মাঝে মাঝেই বেগুনভর্তা আর গরম ভাত যেতে লাগল তার কাছে। তিনিও পরম তৃপ্তির সাথে খান সেই ভাত। সেই বুড়িমা, মাস্টার আনোয়ারুল ইসলাম– এমনি হাজার হাজার দরদি মানুষ রয়েছেন আশপাশের এক বিরাট এলাকাজুড়ে। তাদের ফেলে তারা এখান থেকে সরে যাবেন কীভাবে!

মাস্টার সাহেব জমির ভাইয়ের কাছে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলেন– বাবা, সে চিন্তা তুমি একদম করবা না। আমাদেরও কিছু অস্ত্র ট্রেনিং আছে। তাছাড়া তোমরাও তো সত্যি সত্যি পালিয়ে যাচ্ছ না; ক্যাম্প আক্রমণের পরপরই কিছু দূরে শেখদের বড়ো মেহগনি বাগানে লুকিয়ে থাকবা। সেখানেই তোমরা পরবর্তী হামলার জন্য রেডি থাকবা। এটা তো একটা কৌশল মাত্র। তুমি নিশ্চয়ই জানো যুদ্ধে শক্তির চেয়ে কৌশল বড়ো। রায়পুর রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকার আর আর্মিরা জানবে বা জানিয়ে দেওয়া হবে– তোমরা ভয় পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছ। সকালের মধ্যেই এ খবরটা আমি ওদের ক্যাম্পে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব। আমাদের একজন বিশ্বস্ত লোক আছে– কাদের আলি। যে ওপরে ওপরে রাজাকারদের 'বিশ্বস্ত ইনফরমার'; কিন্তু আসলে সে আমাদেরই লোক। তাকে দিয়েই খবরটা পাঠাবো। তখন দেখবা ওদের কাণ্ড। ওরা গ্রামের মানুষদের ওপর হামলা আর জুলুম চালানোর জন্য একেবারে খ্যাঁপা কুকুরের মতো হয়ে আছে। ওরা যখনই শুনবে মুক্তিযোদ্ধারা ভয়ে এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে, তখনই ওরা হায়েনার মতো হামলে পড়বে গ্রামে।

–আর তখনই আমরা সুযোগমতো এগিয়ে এসে ওদের সাবাড় করে দেবো, তাই না স্যার? তখন ওদের সুরক্ষিত বাঙ্কার থাকবে না, চার দেওয়ালে ঘেরা ক্যাম্পও থাকবে না। ওরা তখন একেবারে খোলা জায়গায় গ্রামের মানুষের ঘরবাড়ি পোড়ানো আর মালামাল লুটপাটে মহাব্যস্ত থাকবে, তাই তো স্যার?

জমির ভাইয়ের কথায় মাস্টার সাহেব বলেন– ঠিক তাই। এই সুযোগেই নেমকহারামদের খতম করতে হবে। আর প্রিয় কমান্ডার, তোমরা হয়ত ভাবতে পারো, রাজাকারদের হামলায় প্রাথমিকভাবে গ্রামের কিছু মানুষ তো মারা যাবে– তাদের বাঁচানো যাবে কীভাবে! আমি বলি– কারও কিচ্ছু হবে না। আমরা রাজাকার ক্যাম্পের কাছাকাছি তিনটি গ্রামের সব মানুষকে গোপনে দূরের কয়েকটি গ্রামে সরিয়ে নেব আজ রাতের মধ্যেই এসব গ্রামে স্বাধীনতাবিরোধী বেঈমান একজনও নেই। তাই এই সরে যাওয়া মানুষদের বিষয়ে কেউ কিছু জানতে পারবে না। তবে তাদের ঘরের ধান-চাল, গরু-ছাগল এসব থাকবে শত্রুদের টোপ হিসেবে। মনে করো এটা একটা ফাঁদ। রাজাকারেরা এসে যখন বাড়িঘরে কাউকে পাবে না, তখন কিছু বাড়িঘরে আগুন লাগাবে। তবে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী হবে ঘরের ধান-চাল, গরু-ছাগল আর অন্য মালসামান লুটপাটে। সেজন্য ওরা অবশ্য বেশি সময় পাবে না। এর আগেই তোমরা পজিশন নেবে মানুষের বাড়িঘরে। তারপর তোমাদের আচমকা হামলায় ওরা একেবারে কেরাসিন হয়ে যাবে। ইঁদুর যেমন খাওয়ার লোভে ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারায়, ওদের অবস্থাও হবে তেমনি। কী কমান্ডার, আমার প্ল্যানটা কেমন মনে হচ্ছে?

জমির ভাই খুশিতে জড়িয়ে ধরেন পিতৃসম মাস্টার সাহেবকে, তারপর বলেন– স্যার, আপনার এ প্ল্যানের জবাব নেই। তুলনাহীন, এক্সিলেন্ট! তবে স্যার, আমাদের আসার আগে রাজাকারেরা কিছু বাড়িতে আগুন দেবে। [চলবে...] ■

শিশু সাহিত্যিক

বাবা আমার

সাবিত্রী রানী

বাবা আমার শ্রেষ্ঠ মানুষ বিশ্ব ভুবনময়
বাবা-মায়ের আশীষে সন্তান অস্তিত্বময়।

আমি যেদিন জন্ম নিলাম ঘর আলো করে
বাবা আমায় কোলে নিলেন খুশিতে মনভরে।

বাবা-মায়ের আদর স্নেহে বেড়ে উঠি সুখে
সব আবদার পূরণ করেন বাবা হাসি মুখে।

'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' শাস্ত্রের বচন
পিতামাতার মতো নয়ত কেউ আপন।

আমায় নিয়ে বাবার মনে আছে স্বপ্ন যত
শপথ নিলাম পূরণ করব আমি সাধ্যমতো।

ঠর্‌র ঠক

সুলতানা লাবু

ঠর্‌র ঠক ঠর্‌র ঠক। ঠক ঠক। ঠক ঠক। ঠর্‌রর।
ভরদুপুরে এত আওয়াজ! না, ঘরে থাকাই দায়। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঘুঘু।
হাঁক দিলো ঘুঘু, 'ঠক ঠক করে কে?'
'আমি কাঠঠোকরা।'
'কাঠঠোকরা!' অবাক হলো ঘুঘু। 'তাহলে বাঁশ ঠোকরাও কেন?'
'পোকা খাই।'
শুনে ঘুঘুর মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল। বলল, 'বাঁশঠোকরা তো নও। তাহলে বাঁশবনে কেন?'

‘এখানে অনেক পোকা।’
‘পোকার কী অভাব পড়েছে? কাঠঠোকরা যখন কাঠে গিয়েই ঠোকরাও।’
‘এখানে অনেক পোকা। এগুলো খেতে হবে। নইলে যে বাঁশগুলো মজবুত হবে না।’
‘মজবুত! বলো কী? ঠুকরে ঠুকরে বাঁশ ফুটো করে দিতে চাইছ। আবার বলছ মজবুত করছ! আমাকে কি বোকা ভেবেছ? যাও এখান থেকে। আমি এখন ছানাদের ঘুম পাড়াবো।’
‘আমি ঠিক কথাই বলছি। গাছের বাকলের নিচে পোকা থাকে। ওরা গাছ খেয়ে ফেলে। তখন গাছেরা খুব কাহিল হয়ে যায়। পোকাগুলো খেলেই গাছগুলো আবার চাঙা হয়ে যাবে। গাছ না বাঁচলে তোমরা থাকবে কোথায়? তাই আমরা ওই পোকাদের খুঁজে খুঁজে খাই। আমাদেরও পেট ভরে, গাছেরও উপকার হয়।’
ভেংচি কেটে ঘুঘু বলল, ‘আহা! যেন গাছের চিকিৎসক!’
‘তা তুমি ঠিকই বলেছ ঘুঘু বুবু। পোকা খেয়েই গাছের চিকিৎসা করি। তুমি যে বাঁশে ঘর বানিয়েছ ওর ও চিকিৎসা দরকার। ওখানে অনেক পোকা আছে। ওগুলো খাওয়া খুব দরকার।’
‘আমার ছানাদের ঘুম তার চেয়ে বেশি দরকার। যাও তো ভাই বাঁশঠোকরা, না কাঠঠোকরা। অন্য গাছদের চিকিৎসা করো গে।’
চলে গেল কাঠঠোকরা। আর ঠক ঠক আওয়াজ নেই। নিঝুম হয়ে গেল বাঁশবন। আহ, কী আরাম! ঘুঘুর চোখ দুটো ঘুমে বুঁজে আসছে। ছানাদেরও ঘুমিয়ে পড়তে বেশি দেরি নেই।
হঠাৎ...
শুরু হলো ঝড়ো বাতাস। বাঁশগুলো খুব দুলতে লাগল। ঘুঘুর ঘরও দুলতে লাগল। দুলতে দুলতে মনে হয় বুঝি বাসাটা মাটিতে পড়ে যাবে। ভয় পেল ঘুঘুর ছানারা। ঘুঘু বলল, ‘ভয় পেয়ো না ছানারা। আমি তো আছি! তোমাদের আগলে রেখেছি।’
ঝড়ের সাথে এবার শুরু হলো বৃষ্টি। ঝুম বৃষ্টি। আরো জোরে দুলতে লাগল ঘুঘুর বাসা।
হঠাৎ একটা আওয়াজ।
ম-ট-ম-ট। ম-ট-ম-ট। কয়েকটা বাঁশ ভেঙে পড়ে গেল মাটিতে।
বৃষ্টি থামতে থামতে বিকেল। আর বৃষ্টি থামতেই সেই কাঠঠোকরা এসে হাজির। ঘুঘুকে দেখেই চমকে উঠল, ‘এ কী! তোমরা মাটিতে কেন? বিপদ হবে তো!’
ঘুঘু বলল, ‘আমাদের বাসা পড়ে গেছে। যে বাঁশে বাসা বানিয়েছিলাম, ওটা ভেঙে গেছে। আরেকটু হলে আমরাও বাঁশের নিচে চাপা পড়তাম।’
ঘুঘু আর ওর ছানারা তখনও কাঁপছিল। খুব ভয় পেয়েছে ওরা। শীতও করছে খুব। যা বৃষ্টি হয়েছে। পুরো শরীর ভিজে চুপচুপে।
কাঠঠোকরা বলল, ‘রাত নামার আগেই তোমাদের একটা নতুন বাসা দরকার। নইলে বিপদে পড়বে।’
অবাক হলো ঘুঘু। বলল, ‘এখন নতুন বাসা কোথায় পাবো?’
কাঠঠোকরা বলল, আমি দেখছি। তোমরা এখানেই থাকো।’
বলেই চলে গেল কাঠঠোকরা। তারপর খানিক বাদেই শুরু হলো আবার। ঠক ঠক ঠকর। ঠকর ঠকর। ঠকর ঠকর ঠক। ঠর্‌র ঠর ঠর।
এবার মনে হয় অনেকগুলো কাঠঠোকরা ঠক ঠক করছে। খুব জোরে আওয়াজ আসছে। ছানাদের নিয়ে এমনিতেই বিপদে আছে ঘুঘু। তার ওপর ঠকর ঠক আওয়াজ। ছানারা মায়ের ডানার নিচে চুপটি করে বসে আছে। আর ঘুঘু নিজের মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে পালকের নিচে। আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল যে! কখন এ আওয়াজ থামবে কে জানে।
হঠাৎ পালকের তলা থেকে মাথা বের করল ঘুঘু। আরে! আওয়াজ নেই। এদিক-ওদিক তাকালো। আর তাকিয়ে দেখল ওর ঠিক সামনে সেই কাঠঠোকরা।
কাঠঠোকরা বলল, ‘চলো বুবু, তোমার জন্য নতুন ঘর বানিয়েছি।’
ঘুঘু তো অবাক। বলল, ‘এত তাড়াতাড়ি!’
‘আমরা সব বন্ধু মিলে বানিয়েছি। জলদি ঘরে চলো। রাত হতে আর দেরি নেই।’
ঘুঘুকে নতুন ঘর দেখিয়ে দিলো কাঠঠোকরা। তারপর নতুন ঘরে ছানাদের নিয়ে এল ঘুঘু। মজবুত বাঁশের ঘর। ঘর দেখে ঘুঘু তো ভীষণ খুশি। ছানারাও খুশি। বাঁশের ঘরটা ওদের খুব ভালো লেগেছে।
একটু পর আবার ...
ঠক ঠক ঠক। ঠকর ঠকর। ঠক ঠক। ঠর ঠর।
দূরে কোথাও কাঠঠোকরা বাঁশ ঠুকছে। কী অবাক! এখন আর আওয়াজটা বিদঘুটে লাগছে না। বরং খুব মধুর লাগছে। কান পেতে ওরা সেই মধুর আওয়াজ শুনছে...
ঠর্‌র ঠক ঠর ঠক। ঠক ঠক। ঠক ঠক। ঠর্‌রর। ■

শিশু সাহিত্যিক

বাবার বুক ভরা স্নেহ

নাসিম সুলতানা

সাথী ভাবছে আর কদিন পরে ঈদ। খালাম্মার কিছু কিছু কথা তার কানে এসেছে। সে বুঝতে পেরেছে, ঈদের সময় তাকে ঘরে একা রেখে তালা দিয়ে দেশে যাবে। এ কথা ভেবে সাথীর বুক ফেটে কান্না আসছে। সে কেমন করে এত বড়ো বাড়িতে একলা থাকবে। আজ বাবা-মা'র কাছে থাকলে তো সাথীর ভাগ্য এ রকম হতো না। হায় ! মা মারা যাওয়ার পর সৎ মা আসলো। সৎ মায়ের কাছে সাথীর আদর কমে গেল। ঠিকমতো খেতে-পরতেও দিত না। সাথীর এ অবস্থা দেখে পাশের বাড়ির করিম চাচা বলেছিলেন, তোর বাবার সাথে কথা বলে ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাসায় তোকে কাজে দিমু। সাথীর সব মনে পড়ে। করিম চাচা আরোও বললেন- ও পাড়ার লাইলি আছে না, তার বাসায়। সে ঢাকায় থাকে। তার একটা ছোটো ছেলে আছে। ওকে দেখে রাখতে পারবি ন?

এর দিন দুই পরের কথা। বাবার সাথে কথা বলে, সাথীকে পর দিন ঢাকায় নিয়ে এল।

সাথী গ্রামের স্কুলে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিল। সে খুব বুদ্ধিমানও। এত তাড়াহুড়োর কারণে সাথী তার খেলার সাথিদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেনি। আসার সময় বাবা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছিল, মা আর কয়েক মাস পর রোজা। ঈদের সময় ওগো সঙ্গে বাড়ি আইসো। আমি হাটের থেইকা তোমার জন্য একটা লাল জামা কিনা আনমু। সাথী বাবাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছিল। সাথীর সব মনে পড়ছে।

শুরু হলো সাথীর নতুন জীবন। সাথী কেমন যেন একা হয়ে গেল। লাইলি খালা চাকরি করেন। খালুও চাকরি করেন। আর তাদের ছেলেটা প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। তিনজনই সেই সকালে নাশতা খেয়ে বের হয়। যাওয়ার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে যায়। সাথী গ্রামের মেয়ে। চঞ্চলা হরিণীর মতো তার স্বভাব। গ্রামের হই হুলোড়ে সে বড়ো হয়েছে। আর এখন-এর বিপরীত। চার দেয়ালের মধ্যে আটকে থেকে সাথী শুধুই কাঁদে।

সারাদিন শুধু কাজ আর কাজ। কোথাও এক ফোটা ধুলাবালি থাকা চলবে না। তাহলে লাইলি খালার মুখ ঝামটা তো আছেই। ফার্নিচার মোছা, এতগুলো ঘর মোছা, কাপড় ধোয়া, ডাল-ভাত রান্না করা... সাথী যেন অথৈ সমুদ্রে তলিয়ে যেতে থাকল। কয়েকদিনের মধ্যে সাথীর সেই চঞ্চলতা, গুনগুনিয়ে গান গাওয়া সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

লাইলি খালা তার ছেলে ফাহিমকেও সাথীর কাছে আসতে দেয় না। সাথী ছেলেটাকে আদর করতে চায়। ফাহিমের সঙ্গে খেলতে চায়। কিন্তু ওর মা মনে করেন ফাহিম যদি তার সঙ্গে খেলাধুলা করে তবে সাথী আস্কারা পেয়ে যাবে। কাজের মেয়েকে কন্ট্রোলে রাখতে হয়। সাথীর লাইলি খালা শহরে এসে বদলে গেছে। কেমন যেন দয়ামায়াহীন এক মানুষ।

সাথীর মনে অনেক দুঃখ। সে কেমন করে এই বন্দি জীবন থেকে মুক্ত হবে ? তার না খেয়ে গ্রামে থাকাই ভালো ছিল। সেখানে তার খেলার বন্ধুরা ছিল। মুক্ত বাতাসে অবাধে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ ছিল।

ফাহিমের আব্বু অফিসের কাজে প্রায়ই দেশের বাইরে

থাকেন। দু'দিন হলো তিনি এসেছেন। তিনি ফাহিমের জন্য অনেক কিছু এনেছেন। তিনি সাথীকে ডাক দিয়ে একটি জামা দিলেন। জামাটা পেয়ে সাথী খুব খুশি হলো। এত সুন্দর জামা সাথী জীবনে কখনো দেখেনি।

কিন্তু লাইলি খালা ও ঘর থেকে এসে বিপত্তি বাধালেন। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন– এত লাই দিও না। জামাটা ঈদে দিতে পারতে, আমাকে বললেও তো পারতে?

লাইলি খালার কথা শুনে খালুও রেগে গেলেন। তিনি বললেন-ছোট্ট একটি মেয়ে, তোমার গ্রাম থেকে এনেছ। আর তুমি কি না ওর সাথে এত খারাপ ব্যবহার করো!

এভাবে অনেক দুঃখ, অপমানে, অবহেলায় সাথীর দিনগুলো কাটতে থাকে। এর মধ্যে রোজাও শুরু হয়ে গেল।

ক'দিন পর আবার সাথীকে নিয়ে খালাম্মা খালুর মধ্যে ঝগড়া। লাইলি খালা এবার বাবার বাড়ি ঈদ করতে যাবে। সঙ্গে খালুও যাবেন ফাহিমকে নিয়ে। সাথীকে ঘরে তালা মেরে রেখে যাবেন। খালার এ রকম কথা শুনে খালু তো রেগে আগুন।

খালু বললেন– তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি স্বার্থপর টাইপের। এতটুকু মেয়েকে তুমি তালা দিয়ে এতদিনের জন্য বাড়ি যাবে। ওর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তো এর জন্য কে দায়ী হবে? তুমি না আমি। আমার মান-মর্যাদা সব যাবে। তার চেয়ে আমি আর সাথী এখানেই ঈদ করব, তোমরা মা-ছেলে বাড়িতে যাও। ফাহিম লাফ দিয়ে বাবার কোলে বসল। বলল, বাবা বাবা সাথী আপুও যাবে আমাদের সাথে, তাই না বাবা।

এভাবে সাথীর অনেক দুঃখে কষ্টে দিন যেতে যেতে দেশের বাড়িতে যাওয়ার দিনটি ঘনিয়ে এল। খুব ভোরে উঠে ওরা রওনা দিলো। সাথী কিছুই খেলো না। কারণ বাসে ওর বমি হয়। ওকে জানালার কাছে বসতে দেওয়া হয়েছে। সে ভাবছে খালুর জন্যই ওর দেশের বাড়িতে ঈদ করতে যাওয়া হচ্ছে। লাইলি খালার কথা মনে হতেই তার গ্রামের বাড়িতে কষ্টে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। দু'বেলা পেট পুরে খাওয়া ও একটু আদর-স্নেহ পাওয়ার জন্য সাথীর ঢাকাশহরে আসা। কিন্তু সাথী কী পেল ?

বুক ভরা ব্যথা নিয়ে সাথীকে গ্রামে ফিরে যেতে হচ্ছে। না আর শহরে নয়, তার গ্রামই ভালো। না খেয়ে থাকলেও সেখানে তার বাবা আছে। বাবা তো কোনোদিন তাকে শহরে কাজের জন্য যেতে বলেনি। নিজের ভাতের থালাটা মেয়েকে দিয়ে বলত– মা খাও! বাবা-মা'র মতো কি কেউ আছে। সাথীর মা নেই। বাবা তো আছে। আর সেখানে তার খেলার সাথীরা আছে। ঝড়ের দিনে বন্ধুরা মিলে আম কুড়াতে যাওয়া, পুকুরে ঝাপ দিয়ে গোসল করা, বই নিয়ে একসাথে স্কুলে যাওয়া, আহ্ কি যে আনন্দের দিনগুলো এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। খালুর ডাকে সাথী ধরমর করে উঠল। সে দেখে তারা কদমতলি বাসস্ট্যান্ড-এ পৌঁছে গেছে। গ্রামে যাওয়ার জন্য তারা ভ্যানগাড়িতে উঠে বসল। সাথী তাদের সাথে ভ্যানগাড়িতে উঠল না। দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারে কদমতলায় তাদের বাড়িতে গিয়ে থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে দেখল ওর বাবা উঠানে রাখা ধানের বস্তাগুলো ঘরে তুলছে।

সাথী ডাক দিলো-বাবা।

সাথীর বাবা পেছনে তাকিয়ে দেখে তার আদরের মেয়ে সাথী। তাকে ঢাকা পাঠিয়ে এক মাস ঘুমাতে পারেনি সে। সাথীর বাবা হাত বাড়িয়ে বলল আয় মা আয়, আমার বুকে আয়। তোরে আর ঢাকা যাই দিমু না। জানিস মা, তোর জন্য হাটের তনে একটা লাল জামা কিনছি। তুই ঈদের দিন জামাটা পিনবি। দুইটা লাল ফিতা ও লাল চুড়িও কিনছি।

সাথীর নতুন মা দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখল। তারও চোখে অশ্রু চিকচিক করে উঠল। সে মনে মনে ঠিক করল সাথীকে আর বকবে না। কারণ তারও তো একটি মেয়ে হয়েছে। আজ যদি তার ভাগ্যটা সাথীর মতো হয় তাহলে ?

সাথী বাবাকে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না। দিনের দুঃখের ভারে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

সাথীকে আর শহরে কাজ করতে যেতে হবে না। বাবার বুকে মাথা রেখে সে অনেক অনেক শান্তি অনুভব করল। সাথীর মনে পড়ল পাশের বাড়ির ময়না খালা যে গানটি শুনত তার কয়েকটি লাইন–

আয় আয়... আয় খুকু আয়
মনে হয় বাবার মতো কেউ বলে, না
আয় খুকু আয়... আয় খুকু আয়। ■

গল্পকার

বাবার কথা

মেজবাউল হক

বাবা প্রতিটি সন্তানের জীবনে সুপার হিরো। একজন ভালো বন্ধু। একজন ভালো গাইড। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্দেশক। বাবার ছত্রছায়ায় সন্তান থাকে নিরাপদ। জীবনে এগিয়ে যেতে ভুল-ভ্রান্তি যতই থাকুক না বাবা আছেন পাশেই। সন্তান হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই ধরে নেয়, অভাব অনটনের মাঝে থাকলেও তার আঁচ সন্তানের ওপর লাগতে দেন না। প্রতিটি সন্তানের মাথার ওপর ছাতা বাবা। মনীষী জর্জ হারবার্ট বলেছেন– 'একজন বাবা শতাধিক স্কুল মাস্টার'।

প্রতিবছর জুন মাসের তৃতীয় রোববার বিশ্বজুড়ে পালিত হয় 'বিশ্ব বাবা দিবস'। বাবার হাত ধরেই সন্তানের জীবন এগিয়ে যাওয়া। বাবার কঠোর শাসনেও থাকে কোমল ভালোবাসা আর উদার স্নেহ। ভাষা ভেদে বাবা শব্দ বদলায়, স্থান ভেদে বদলায় উচ্চারণ। তবে বদলায় না রক্তের টান। বাবার প্রতি সন্তানের চিরন্তন ভালোবাসার প্রকাশ প্রতিদিন ঘটে। তারপরও সেই বাবার জন্য বছরের একটি দিন একটু অন্যভাবে উদ্‌যাপন করেতেই বিশ্ব বাবা দিবস পালন করা হয়। এ দিবসটি পালন শুরু হয় গত শতাব্দীর প্রথম দিকে। দুনিয়ার সকল বাবাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের ইচ্ছে থেকেই যার সূচনা। যেমনটা মা কে নিয়ে আছে মা দিবস।

১৯শে জুন, ১৯১০ সাল। সর্বপ্রথম বাবা দিবস উদ্‌যাপিত হয় স্পোকেনস শহরে। শহরের ছেলেমেয়েরা দুইটি করে গোলাপ নিয়ে যায় চার্চে। একটি হলো লাল, অন্যটি সাদা। লাল গোলাপটি জীবিত বাবাদের শুভেচ্ছার জন্য, আর সাদা গোলাপটি মৃত বাবাদের আত্মার শান্তির জন্য। বিষয়টি পুরো মার্কিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় ও বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়। পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'বাবা দিবস' পালন শুরু হয়। অবশেষে ১৯৬৬ সালে ৫৬ বছর পর বাবা দিবসকে দেওয়া হয় জাতীয় মর্যাদা।

বন্ধুরা, বছর ঘুরে ১৯শে জুন আমাদের দেশে পালিত হলো বাবা দিবস। বিশ্বের ৫২টি দেশে জুন মাসের তৃতীয় রোববার প্রতিবছর দিবসটি পালিত হয়। সন্তানের মুখ থেকে বাবা শব্দটি যখন শোনা যায় তখনি বাবার সব কষ্ট নিমিষেই শেষ হয়ে যায়। আর বাবা নানা রকম ত্যাগ স্বীকার করে ছায়ার মতো আগলে রাখেন। তাই বন্ধুরা, শুধু বাবা দিবসে নয় আমরা আমাদের বাবাদের ভালোবাসব প্রতিটি দিন। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাব প্রতিটি ক্ষণ। বাবা পেশায় কি সেটা বড়ো কথা নয়, তিনি যে একজন 'বাবা' এটাই বড়ো কথা। ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা আমাদের বাবাদের সাথে সময় কাটাব। তাদের মন ভালো করতে দিতে পারি উপহারও। ভালো থাকুক আমাদের বাবারা। ■

শ্রদ্ধাভাজন

হামিদ আবরার

আমারই দুঃখের ভাগে তিনিই
আমার মিতা,
তিনি যে আমার শ্রদ্ধাভাজন,
প্রাণপ্রিয় পিতা।
ব্যর্থতা, গ্লানি, দুঃখ যখন করত
আমায় হতাশ,
তখনই তিনি যোগাতেন মোরে
অগাধ সাহস, বিশ্বাস।
অজানা গোপন কথায় যখন রুদ্ধ
মনের দ্বার,
সকলের আগে কর্ণগোচর
করিতাম নিকটে তাঁর।
তাই তো তোমায় দেখিলে
ব্যথিত, আমার মনে ব্যথা,
তোমার বদনে ফুটিলে হাসি, ধন্য
আমি- পিতা।

ফল

মেশকাউল জান্নাত

মধুমাসে দেখা মিলে
অনেক মজার ফল
নিয়মিত খেলে তবে
শরীরে আসবে বল।

ছোটো বড়ো নানান স্বাদে
খেতে মজা ভারি
পুষ্টিগুণে ভরা ফলগুলো
খেতে করব না দেরি।

৮ম শ্রেণি, খিলগাঁও আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

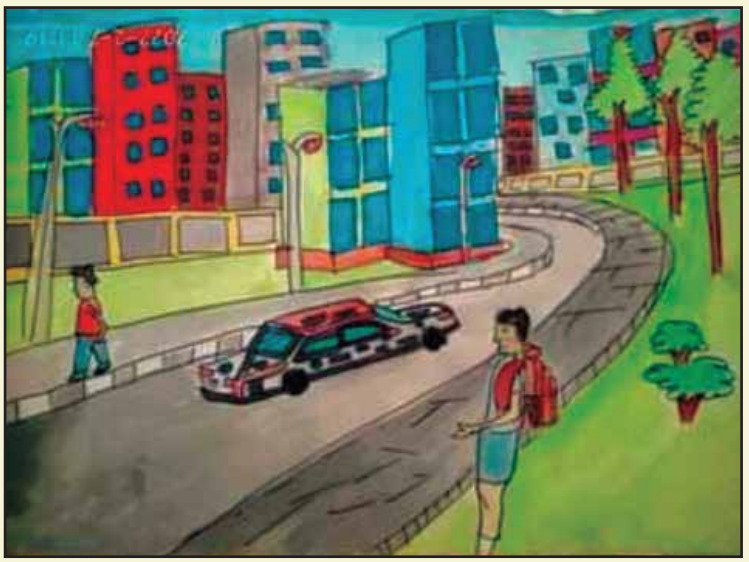

মিরাজুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণি, নারিশা উচ্চ বিদ্যালয়, দোহার, নবাবগঞ্জ

গল্প

ওর নাম টাইগার

ওয়াহিদ মুস্তাফা

ওর নাম টাইগার। না না, আসল টাইগার না। সে একটি বিড়াল। আমার পোষা বিড়াল। সেই টাইগারটা না– একদিন একটি ইঁদুর ধরল। কিন্তু ইঁদুরটাকে সে মারেনি, খায়ওনি। শুধু খেলছে ওর সাথে।

টাইগার আমার কাছে এসে বলল, এ হচ্ছে আমার বন্ধু র‍্যাট।

আমি তো ইঁদুর দেখে ভয়ে অস্থির। তখন ইঁদুরটাকে টাইগার বলল, যাও বন্ধু, মা'র কাছে যাও। ইঁদুরটা লাফাতে লাফাতে চলে গেল ধানের গোলার দিকে। ওরা সেখানেই থাকে। সেখানে না-কি তার একটা ছোটো বোনও আছে।

আমি টাইগারের ওপর ভারি খুশি হলাম ইঁদুরকে বন্ধু বানিয়েছে বলে। খুশি হয়ে বললাম, তোকে আজ নিজের হাত দিয়ে খাওয়াবো টাইগার। তা শুনে টাইগার অনেক খুশি হলো।

টাইগার সবসময় আমার সাথে সাথে ঘুরে। যেখানে আমি যাব, সেও সেখানে যাবে আমার সাথে সাথে। একদিন আমরা বাড়ির সামনে খেলছিলাম। টাইগার সেখানে এসে আমাদের সাথে খেলতে চাইল।

আমি, তালিম , আবির , সাবিত , নিশান , জুনাইদ , মাসাব, মেশকাত সবাই ওর দিকে তাকালাম। জুনাইদ বলল, তুমি তো অনেক ছোটো বাবু। কেমনে খেলতে পারবা? তখন টাইগার মুখ কালো করে চলে গেল। আমি জুনাইদকে বললাম, ছি জুনাইদ, ছোটোদের সাথে এভাবে কথা বলতে হয় না। জানো, ও ইঁদুর ধরে খায় না, শুধু খেলে তার সাথে। ও কত ভালো, তাই না?

তখন জুনাইদ খুব লজ্জা পেল। বলল, ওয়াহিদ ভাই, আর অমন কথা বলব না।

পরেরদিন আবার টাইগার এল। দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের খেলা দেখছে। কিছু বলছে না। মুখ কালো। তখন জুনাইদ, নিশান, মেশকাত ওরা ছুটে যায় টাইগারের কাছে। বলে, টাইগার, এসো তুমিও খেলবে আমাদের সাথে। দেখাও তো, কি খেলা জানো তুমি।

তখন টাইগার খুব খুশি হলো। তারপর উপর দিকে তিড়িং করে দিল এক লাফ। অনেক উপরে উঠল, আবার নিচে পড়ল। কয়েকবার ডিগবাজি দিলো।

তখন আমরা সবাই হেসে কুটিকুটি। তারপর বললাম, টাইগার, তুমি পরীক্ষায় পাস। এখন এসো, আমরা সবাই একসাথে খেলি।

তারপর আমরা সবাই খেলায় মেতে উঠলাম। ■

৩য় শ্রেণি, শিশুকলি নার্সারি স্কুল, বাঘারপাড়া, যশোর

গাছ বাড়ি

আতিকুল ইসলাম

একটি মাত্র পৃথিবী
মহাবিশ্বে কোটি কোটি ছায়াপথ,
আমাদের ছায়াপথেও আছে কোটি কোটি গ্রহ,
কিন্তু 'পৃথিবী' আছে শুধু একটি।
আসুন সবাই মিলে এর যত্ন নিই।

বন্ধুরা তোমরা তো জানো এখন বর্ষাকাল হলেও গ্রীষ্মে ও সূর্যের প্রখর তাবদাহে প্রকৃতি এক ভয়াল মূর্তি ধারণ করেছিল। প্রতিদিনই প্রায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকেছে। জলবায়ুর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো বৃক্ষ নিধন। একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকার কথা থাকলেও আমাদের দেশে আছে মাত্র ১৬ ভাগ। যেটুকু আছে তাও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে হচ্ছে বিভিন্ন কারণে। বনভূমি উজাড়ের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। আর কমছে অক্সিজেনের পরিমাণ। অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গলে যাচ্ছে মেরু অঞ্চলের বরফ এবং বাড়ছে সমুদ্রের উচ্চতা। ধেয়ে আসছে জলোচ্ছ্বাস, তলিয়ে যাচ্ছে নিম্নাঞ্চল। নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে হলে বৃক্ষরোপণসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের এখনই সজাগ হতে হবে। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল রক্ষাকারী ঝাউবেষ্টনী সৃষ্টি করেছিলেন। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে জানমালের সুরক্ষা দিতে বেড়িবাঁধ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও মুজিবকিল্লা নির্মাণ করেছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমাদের দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। প্রতিবছর সবাই যদি একটি করে গাছের চারা রোপণ করি, তবে প্রকৃতি অপরূপ হয়ে উঠবে। একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান-জার্নাল 'সায়েন্স'-এ প্রকাশিত সুইজারল্যান্ডের জুরিখে সুইস ফেডারাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির (ইটিএইচ জুরিখ) একটি গবেষণা বলছে- কমপক্ষে এক লাখ কোটি গাছ লাগালে বাতাসে কমবে বিষ। আমাদের বায়ুমণ্ডল হয়ে উঠবে ১০০ বছর আগের মতো। আরো

বলা হয়েছে, শুধু গাছ লাগালেই জীবন বাঁচবে। যত বেশি গাছ লাগাব, দেশ তত বেশি নিরাপদে থাকবে। গাছ বিপদের বন্ধু। গাছ আমাদের তাপদাহ ও বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচাবে। বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কমাবে, নিরাপদ একটা দেশ পাবো। এখন আষাঢ়-শ্রাবণ মাস। গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়। 'গাছ লাগাবো পরিবেশ বাঁচাবো'– এই হোক আমাদের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণে আমাদের সচেতন হতে হবে। প্রতিটি বাড়ির আঙিনা-ছাদে গাছ লাগাতে হবে।

বর্তমানে বৃক্ষরোপণের জনপ্রিয় বিষয় হলো ছাদবাগান। সেই সাথে মানুষে এখন নিজের চিলতে ব্যালকনিও গাছ দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ছাদবাগান এটা নতুন কোনো ধারণা নয় যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বেও ছাদবাগান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান। ঐতিহাসিকভাবে ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যানের অস্তিত্ব না মিললেও ধারণা করা হয়, বিভিন্ন ছাদ ও বারান্দার সমন্বয়ে তৈরি ছিল সেটি। তবে ইতিহাসে ইরাকের মোসুল শহরের কাছেই আরেক ঝুলন্ত উদ্যানের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বসতি বাড়ার সাথে সাথে এখানকার পরিবেশ দিন দিন প্রতিকূলে যাচ্ছে। অধিক জনসংখ্যা, অতিরিক্ত নগরায়ণ, যানবাহন, জলাধার ও গাছপালা কমে যাওয়ার কারণে যেহেতু সমতলে গাছ লাগানোর জায়গা অপ্রতুল তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি শহরের সব ছাদে পরিকল্পিতভাবে বাগান করা হয়, তাহলে তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমানো সম্ভব।

তবে ভবনের ছাদে কিংবা এর কাঠামোতে বাগান করা গেলে বাগানের গাছ এ তাপ শুষে নেয় এবং গাছের দেহ থেকে যে পানি জলীয়বাষ্প আকারে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে যায়, তা সেই স্থানের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমিয়ে আনে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শহর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছাদবাগান প্রকল্প সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে তা কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ বেশকিছু ক্ষতিকর উপাদানের মাত্রা কমিয়ে দূষণ কমাবে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করবে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের জন্য। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ নির্মল থাকবে, অন্যদিকে পারিবারিক প্রয়োজনও মিটানোর সুযোগ রয়েছে।

প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ছাদবাগানের দিকে ঝুঁকছে। একটা সময় বাড়ির ছাদে কিংবা ব্যালকনিতে গাছ লাগানো শখ মনে করতেন অনেকে। শহরের অভিজাত এলাকাগুলোতে বাড়ির ছাদে, বাসার ব্যালকনিতে ফুল, ফলের গাছ দেখা যেত। তবে খুশির খবর হলো, এখন ঢাকার আবাসিক কিংবা বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে গাছ দেখা যাচ্ছে। দিন দিন এর পরিমাণ বাড়ছে। ছাদবাগান করতে উৎসাহিত করছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বাড়ির মালিকদের ছাদবাগানে উৎসাহিত করতে ১০ শতাংশ হোল্ডিং ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে সরকার। যেসব বাড়ির মালিক ছাদে, বারান্দায়, বাসার সামনে বাগান করবেন তাঁরাই এ সুযোগ পাবেন। আর এ সুযোগ পেতে অনেকেই এখন ছাদে বাগান করছেন। প্রতিবছর ঢাকায় বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা হয় বৃক্ষপ্রেমীরা মেলায় আসেন, পছন্দের গাছ কেনেন। এর বেশিরভাগই স্থান পায় রাজধানীর বিভিন্ন বাড়ির ছাদ, ব্যালকনি কিংবা বাসার সামনের খোলা জায়গায়। এসব চিত্রই বলে দেয়, ঢাকায় এখন ৬০ ভাগ বাড়ির ছাদে বাগান করা হয়েছে। যাদের ছাদ নেই, ভাড়া বাসায় থাকেন, তারাও কিন্তু বসে নেই। বাসার ভিতরে, দরজার সামনে, সিঁড়ির গোড়ায় কিংবা ব্যালকনি থাকলে সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগাচ্ছেন তারা। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। সেই আহ্বান বাস্তবায়নের সময় এসেছে। আমাদের শুধু গাছ লাগালেই হবে না বরং গাছ লাগাতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে তিনটি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

ছাদবাগানের সুনির্দিষ্ট মডেল এদেশে এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। তবে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচারাল বোটানি বিভাগের ছাদে বাগানের একটি নতুন মডেল তৈরি করা হয়েছে, যার নাম 'নিবিড় ছাদবাগান'। সেখানে বাগানের মোট ক্ষেত্রফলের সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ রাস্তা, ১০ শতাংশ বসার জায়গা, ৪০ শতাংশ শাক-সবজি, ১০ শতাংশ ফুল ও শোভাবর্ধক গাছ, ২০ শতাংশ ফল, মসলা ও ওষুধি এবং ৫ শতাংশ অন্যান্য গাছের জন্য বিবেচনায় রেখে বাগানের মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে। এ মডেলের বৈশিষ্ট্য অধিক জীববৈচিত্র্য, খুবই আকর্ষণীয়, বিনোদন ও খাদ্য উৎপাদনের জায়গা হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। এ মডেলকে সামনে রেখে আমাদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ছাদে বাগান করে শহরে গাছপালা বর্ধনের মাধ্যমে জীবের জন্য নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে । প্রতিটি আবাস যেন শুধু বাড়ি না হয়ে গাছ বাড়ি হয়ে উঠে। ■

প্রাবন্ধিক

এক পায়ে স্কুলে যাওয়া

আবদুর রহমান

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও মনের জোর থাকলে যে-কোনো কাজ সহজ হয়ে যায়। তেমন-ই-একটি কাজ করে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন সীমা । বয়স তার ১০ বছর। প্রতিদিন এক পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়েই স্কুলে যায়। এ জন্য প্রায় ১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। তার বাড়ি ভারতের বিহারের জুমাই জেলায়। দুই বছর আগে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে সে। গুরুতর আহত সীমার বাঁ পা কেটে বাদ দিতে হয়। ডাক্তারদের কাছে পা কেটে ফেলা ছাড়া আর কোনোও উপায় ছিল না। তারপর থেকে সে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া করে। তার স্কুল পাড়ি দেওয়া ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় কিছুদিন আগেই। সেই ভিডিওটিতে সীমার অদম্য ইচ্ছাকেই তুলে ধরা হয়েছে। শারীরিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা অর্জনের জন্য তার চেষ্টা এবং লড়াই অসংখ্য মানুষের হৃদয় জয় করেছে। অনেকে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছেন। সীমার এই ভিডিওটি চোখে পড়েছে অভিনেতা সোনু সুদেরও। তিনিও সীমাকে সাহায্য করার প্রস্তাবও দেন। রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ তাকে একটি কৃত্রিম পা দিয়েছে। সীমা এবার দুই পায়ে হেঁটেই স্কুলে যেতে পারবে। কৃত্রিম পা পাওয়ায় সীমা জানিয়েছে,আমি খুব খুশি এবং সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছার লক্ষে এগিয়ে যেতে চাই। ■

আবু সালেহ
৮ম শ্রেণি
রায়পুরা হাইস্কুল
নরসিংদী

● স্বাস্থ্যকথা

বন্যায় সচেতনতা

পানিবাহিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগসহ নানা কারণে বন্যাপীড়িত মানুষদের মাঝে দেখা দিতে পারে স্বাস্থ্য বিপর্যয়, বন্যার কারণে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এ কারণে ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েডসহ নানা রোগ দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতে, অনেকেই নদীর আশপাশে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। মানুষের এ পয়ঃবর্জ্য এবং ওই এলাকার বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা মিলে জলাশয়ের পানি দূষিত করে। লোকজন তখন যদি এসব জলাশয়ের পানি না করে পান করে, কিংবা কাজে ব্যবহার করে তখন ডায়রিয়া বা পানিবাহিত রোগবালাই হতে পারে।

ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায় তখন। লবণ ও পানির অভাব পূরণ করাই এর একমাত্র চিকিৎসা। শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি বেরিয়ে যায়, তা যদি দ্রুত ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হয়, মানুষ তখনই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে খাওয়ার স্যালাইন, ভাতের মাড় বা অন্য পান করালে শরীরে লবণ-পানির ঘাটতি কমবে। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। যে বয়সের জন্য যে খাবার স্বাভাবিক, তুই খাওয়াতে হবে। রোগীকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। মশা-মাছি কলেরা ও ডায়রিয়া রোগের জীবাণু ছড়ায়। খাবার ঢেকে রাখলে কলেরা ও ডায়রিয়া হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। প্রতিদিন খাবারের আগে ও পায়খানা থেকে ফেরার পর সাবান দিয়ে দুই হাত ভালো করে ধুতে হবে। ডায়রিয়া প্রতিরোধ করা খুবই সহজ। তাই সচেতন থাকলেই ডায়রিয়া বা এ ধরনের পানিবাহিত মারাত্মক রোগ এড়ানো সম্ভব। অবস্থার উন্নতি না হলে দ্রুত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

বন্যার পানিতে গোসল কিংবা গায়ে লাগানো থেকে যতটুক পারা যায় বিরত থাকতে হবে। এই পানির স্পর্শে বিভিন্ন চর্মরোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ সমস্যা এড়াতে হলে গায়ে ভেজা কাপড় রাখবে না, হাত-পা ভালো করে ধুয়ে শুকনা কাপড়ে মুছে রাখবে। বন্যায় নানা রকম বিষাক্ত পোকামাকড় ঢুকে পড়ে মানুষের আবাসস্থলে। তাই ঘরের চারপাশে পানি এলে বেড়া বা দেয়ালের ধার ঘেঁষে ওষুধ ছিটাতে হবে। সবশেষে একটা সুখবর দিয়ে ইতি টানতে চাই, কলেরার প্রতিষেধক টিকা ইতোমধ্যেই সরকারিভাবে খাওয়ানো শুরু হয়ে গেছে। তোমরা সবাই এটা খেয়ে নিবে কিন্তু। ■

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

● ক ন্যা শি শু

বিনা সুদে ঋণ

বাল্যবিবাহ ঠেকাতে প্রথমবারের মতো বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি)। শুরুতে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটের ৫০ পরিবারকে এ ঋণ দেওয়া হবে। করোনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এবং আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণেই খরচ কমাতে দরিদ্র পরিবারগুলোয় বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেড়ে যায়। তাই আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান।
তবে এ ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত মানতে হবে পরিবারগুলোকে

- ঋণের জন্য আবেদনকারীর মেয়ে সন্তান থাকতে হবে।
- তাদের বয়স হতে হবে ১৪ থেকে ১৮ বছর
- মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেওয়া যাবে না
- কন্যাসন্তানের সর্বনিম্ন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

ঋণের টাকা পরিবারগুলো যে ব্যবসার খাটাবে, সেখানে তদারকির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে আমাল ফাউন্ডেশন। ব্যবসার লাভ থেকে ঋণের টাকা শোধ করতে পারবে ঋণগ্রহীতা। অথবা মেয়ে সন্তান চাকরি পাওয়ার পর ঋণের টাকা শোধ করার সুযোগ থাকবে।
আইপিডিসি সংস্থাটি মনে করছে, এ কার্যক্রম সফল হলে দরিদ্র পরিবারগুলোতে আর্থিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি কন্যাসন্তানদের বোঝা হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাবে সমাজে। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

বিস্ময় বালক রুশো

মাহির আলি রুশো। বয়স মাত্র ১৪। এই বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের জটিল সব গাণিতিক ও বিজ্ঞানের সমস্যার সমাধান দিয়ে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অর্জন করেছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং এমআইটির সনদ।রাজধানীর মনিপুর হাইস্কুলের নবম গ্রেডের শিক্ষার্থী রুশো। বাংলাদেশের এ খুদে বালক তার গাণিতিক আর বৈজ্ঞানিক সমাধানে অন্যদের হার মানাচ্ছে। রুশোর জানার আগ্রহটা বেড়ে যায় করোনার মহামারিতে স্কুল বন্ধের সময়। তখন সে আরো বেশি সময় ব্যয় করতে থাকে বিজ্ঞানে। ২০২০ সালের মার্চ থেকে সে অনলাইনে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত, ক্যালকুলাস, ফিজিঙ ও কেমিস্ট্রি বিষয়ে অসংখ্য অনলাইন কোর্সে অংশ নেয়। এর মধ্যেই রুশো জানতে পারে অনলাইনে 'সেন্ট জোসেফ ন্যাশনাল পাই অলিম্পিয়াড' সম্পর্কে। তাতে অংশ নিয়ে হয়ে যায় চ্যাম্পিয়ন। এতে বেড়ে যায় মনোবল। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনলাইন কোর্সে অংশ নিতে থাকে। এখন পর্যন্ত রুশো ৫০টিরও বেশি অনলাইন কোর্স সম্পন্ন করেছে বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ অন্যতম।

রুশো কাছে মনে হয়, সায়েন্স আসলে 'ভয়েস অব গড', যার মধ্যে ডমিনেন্ট করে ফিজিঙ। আর এর মূলে রয়েছে ম্যাথ, যা জানার কোনো বিকল্প নেই। রুশো আসলে কোনকিছু কীভাবে, কেমন করে হচ্ছে সেটা জানতে চেয়েছে। আর এজন্য অবশ্য পড়াশোনা ও জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য।'।■

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

আয়রনম্যান আরাফাত

বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি আয়রনম্যান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ। এখানে একাধারে প্রায় ৪ কিলোমিটার সাঁতারের পর ১৮০ কিলোমিটার সাইক্লিং করতে হয়। তারপর ৪২.২ কিলোমিটার দৌড়। সময় মাত্র ১৭ ঘণ্টা। এমন এক্সট্রিম স্পোর্টসে প্রথম বাংলাদেশি আয়রনম্যান আরাফাত। অদম্য মনোবল নিয়ে মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট জর্জে বিশ্বের কঠিনতম অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা আয়রনম্যান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশীপ-এ। কঠিন প্রতিজ্ঞা তাকে নিয়ে গেছে লক্ষ্যে। আয়রনম্যান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জয় করে লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে।আয়রনম্যান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ শামছুজ্জামান আরাফাত ১৭ ঘণ্টার প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন ১১ ঘন্টা ৩২ মিনিটে।

আয়রনম্যান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের এবারের আসরে অংশ নেন ৩ হাজার ৮০০ প্রতিযোগী।তাদের মধ্যে ২ হাজার ৬৮৫ জন জয় করেছেন আয়রনম্যান চ্যালেঞ্জ। এখানে সময়ের দিক থেকে আরাফাতের অবস্থান ৪৯০তম। বয়সভিত্তিক গ্রুপে ১৯৪ জনের মধ্যে আরাফাতের অবস্থান ৬১তম। ৩২ বছর বয়সি বাংলাদেশের ট্রায়াথলেট মোহাম্মদ সামুজজ্জামান আরাফাত আয়রনম্যান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ১৮ কিলোমিটার সাইক্লিং সম্পন্ন করতে সময় নেন ৫ ঘণ্টা ৫১ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড। এর আগে ৭ই মে নির্ধারিত ৩ দশমিক ৮ কিলোমিটার সাঁতার শেষ করেন তিনি। ১ ঘণ্টা ৯ মিনিটে সাঁতার ও সাইক্লিংয়ের নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করতে আরাফাত সময় নিয়েছেন ৭ ঘণ্টা ৮ মিনিট ১২ সেকেন্ড। বাকি সময়টা লেগেছে ৪২.২ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করতে। প্রতি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে তিনি সময় নিয়েছেন ৯ মিনিট। ■

প্রতিবেদন: তৈয়বুর রহমান

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা লিটন

আইসিসি টেস্ট ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে তুখোড় ছন্দে থাকার স্বীকৃতি পেলেন লিটন দাস। এই তারকা উইকেট রক্ষক ব্যাটার টেস্টে বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরা রেটিং পয়েন্ট অর্জন করেন। এর পাশাপাশি র‍্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে তিনি ১২ তম স্থানে উঠে এসেছেন।

বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির ১লা জুন সর্বশেষ প্রকাশিত টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের সুখবরটি পেয়েছেন তিনি। বর্তমানে লিটনের রেটিং পয়েন্ট ৭২৪। বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান এর আগের সর্বোচ্চ রেকর্ডটি ছিল তামিম ইকবালের। যার রেটিং পয়েন্ট ছিল ৭০৯ পয়েন্ট।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মিরপুরে টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ফিফটি করার ফল বাংলাদেশের সেরা রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্টে নিজের ক্যারিয়ারের সেরা অবস্থানে আছেন লিটন দাস। তিনি ৭২৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে টেস্ট ব্যাটসম্যানদের তালিকায় রয়েছেন ১২ নম্বরে। টেস্ট ফরম্যাটে কোনো বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের এটিই সেরা অর্জন।

চট্টগ্রামের প্রথম টেস্টের পর এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান ৬৬২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ছিলেন ১৭ নম্বরে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৬৮৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে উঠেছিলেন ১৫ নম্বরে। এটা মিরপুর টেস্টে এবার ছিল তার ক্যারিয়ারের সেরা অবস্থান। ■

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

দ শ দি গ ন্ত

আজব স্কুল

এক আজব স্কুল। স্কুলের শিক্ষার্থী মাত্র একজন। এই একজন শিক্ষার্থীকে পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন তিনজন শিক্ষক। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি বন্ধুরা। এটি খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ময়নাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা। স্কুলের একজন ছাত্রের নাম অর্পণ সরকার। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার দুর্গম চরের ময়নামতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। একমাত্র শিক্ষার্থী সে।

ডুমুরিয়ার শিক্ষা অফিসারের মতে, দিন দিন শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে মাত্র একজন ছাত্র অবশিষ্ট রয়েছে বর্তমানে। জানা যায়, ১৯৯১ সালে স্কুল চালুর পর আর দশটা স্কুলের মতোই ছিল এই স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা। তবে দুর্গম এই এলাকাটিতে দিন দিন লোক সংখ্যা কমে যাওয়ায় ২০১৫ সালের পর থেকে কমতে থাকে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও। সর্বশেষে স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে একজনে। শিক্ষা অফিসার স্কুল বন্ধের আবেদন করলেও ১ জন শিক্ষার্থীর জন্য স্কুলটি চালু রাখার দাবি জানিয়েছেন স্কুলের জমিদাতা ও শিক্ষার্থীর মা।

ঢাবির ভর্তি পরীক্ষা দেবেন বেলায়েত

১৯৮৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন বেলায়েত। কিন্তু তখন তার বাবার অসুস্থতার কারণে পড়াশোনা ছেড়ে পরিবারের হাল ধরতে হয় তাকে। এরপর ৫০ বছরে পা দিয়ে ভর্তি হন নবম শ্রেণিতে। এবার উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৫৫ বছর বয়সে তিনি অংশ নিবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায়। দুই ছেলে ও এক মেয়ের পিতা তিনি। তৃতীয় সন্তানের সঙ্গে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন বাবা-ছেলে দুজনেই। অদম্য ইচ্ছাশক্তি যে মনের সব ইচ্ছে পূরণ করতে পারে তা প্রমাণ করলেন শ্রীপুরের বেলায়েত শেখ। ৫৫ বছর বয়সে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেলেও তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য আশা প্রকাশ করেন। ■

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

আমরাও সাঁতার শিখব

পুকুর কিংবা নদীর স্বচ্ছ নীল পানিতে মাছেরা কেমন ভেসে বেড়ায়। ডুবে যাওয়ার কোনো ভয় নেই তাদের। আহা। মাছেদের সঙ্গে আমরাও যদি সাঁতার কেটে পানিতে ভেসে বেড়াতে পারতাম। কী মজাই না হতো তাই না? আমাদের সে স্বপ্নও বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এমনি একটি উদ্যোগ নিয়েছে। এবার শিশুদের পানি ভাষার স্বপ্নও পূরণ হবে। দেশের দুই লাখ শিশুর জন্য ৮ হাজার সমাজভিত্তিক শিশুযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ ১,৬০০ স্থানে ৩ লাখ ৬০ হাজার শিশুকে সাঁতার শেখাবে সরকার।

এ লক্ষ্যে সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান' শীর্ষক একটি প্রকল্পের উদবোধন করা হয়। ১২ই জুন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ প্রকল্পের উদবোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। সমাজভিত্তিক শিশু-যত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও শিশুদের সাঁতার শেখানোসহ অভিভাবকদের সচেতন করা হবে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। দেশের ১৬টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে এ প্রকল্প।

এ প্রকল্পে মোট খরচ ধরা হয়েছে ২৭১ কোটি ৬১ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্লুমবার্গ কিলানফ্লোপিজ এবং যুক্তরাজ্যের রয়্যাল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিউটের অনুদান ৫৪ কোটি ২০ লাখ ৭৩ হাজার টাকা। বাকি ২১৭ কোটি ৬১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে দেওয়া হবে। ২০২৪ সালের ৩০ জুনের মধ্যে প্রকল্পটি শতভাগ বাস্তবায়িত হবে। ■

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

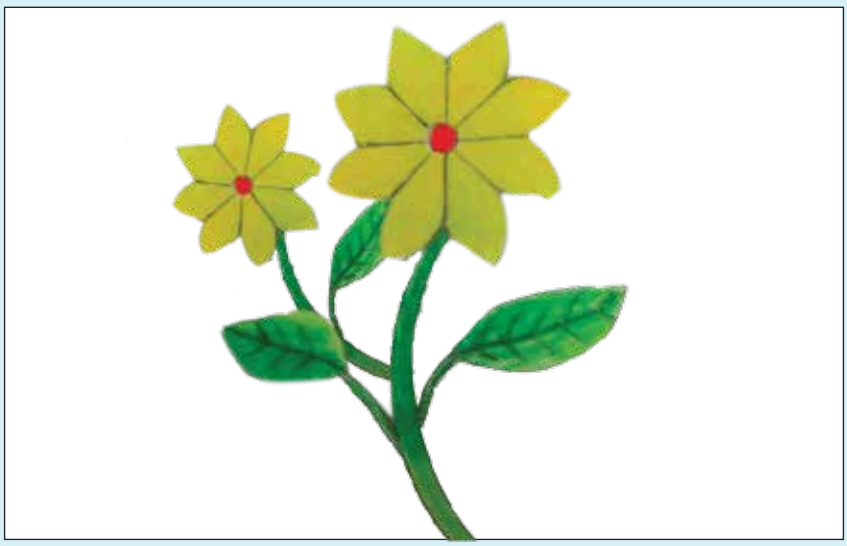

শারিকা তাসনিম নিধি, ৩য় শ্রেণি, চিলড্রেন একাডেমি, চাঁদপুর

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধাঁ

পাশাপাশি: ১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস, ৪.বন্যা, ৭.আধার, ৮. অবিকৃত, ১১.এক ধরনের ফুল, ১২.টক স্বাদ যুক্ত একটি ফল, ১৩.পর্বত, ১৪.সাধারণ মানুষ

উপর-নিচ: ২.যে গান গায়, ৩.চতুষ্পদী প্রাণী, ৫.প্রতিলিপি, ৬.তালা খোলার যন্ত্র, ৭.হঠাৎ, ৮.কম, ৯.এক ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি, ১০.টাঙ্গাইল জেলার পোড়াবাড়িতে উৎপাদিত প্রসিদ্ধ মিষ্টি, ১১.সুন্দরবনে জন্মানো উদ্ভিদ।

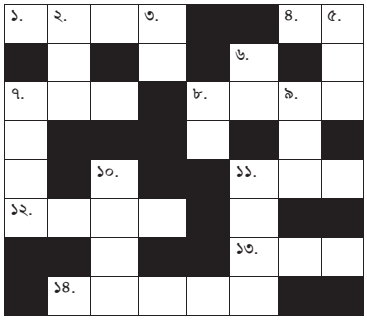

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধাঁর মতোই এক ধরনের ধাঁধাঁ ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: গড্ডালিকা প্রবাহ, বুনন তালিকা, সাল, অনলপ্রবাহ, শব্দ শহর, রস, সাহস, সৎ

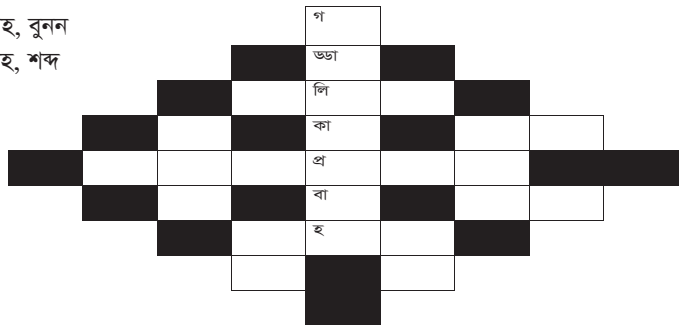

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিস্ক। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

	৭৮			৬৯	১০			৭
৭৬	৮১		৭১			১২	৫	
		৭৩		৬৭	১৪			১
	৬১		৬৫			১৬	৩	
৫৯		৬৩			৪২			১৯
	৫৭	৪৬		৪৪			২৩	
৫৫				৩৯	৪০	২৫		২১
	৫৩		৩৭		৩৩		২৭	
৫১		৪৯		৩৫				২৯

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৯	+		-	৬	=	
/		+		+		+
	*	২	-		=	২
+		*		-		/
৪	+		-	৫	=	
=		=		=		=
	-	৭	+		=	৫

মে মাসের সমাধান

শব্দধাঁধাঁ

	ম	ঙ্গ	ল				
	ং					শা	
	লা	টি	ম			ল	তা
		ক				গ	
	মা	টি		গ	র	ম	
আ		কি	ঞ্চি	ত			
কা				র	জ	নী	
শ	তা	ব্দি				ড়	

ছক মিলাও

				প				
				ষ্মা				
		গ		সে	তা	রা		
	ধূ	ম	কে	তু		খা		
					ছা	ই	দা	নি
	অ	ভি	জ্ঞ	তা		ন		
				ন				
			সা	পু	ড়ে			
				রা				

নাম্ব্রিক্স

৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৪৫	৪৪	১	৪	৫
৫০	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৪৩	২	৩	৬
৫১	৫২	৬৩	৬২	৫৭	৪২	১১	১০	৭
৬৬	৬৫	৬৪	৬১	৫৮	৪১	১২	৯	৮
৬৭	৭০	৭১	৬০	৫৯	৪০	১৩	১৪	১৫
৬৮	৬৯	৭২	৩৭	৩৮	৩৯	২০	১৯	১৬
৭৯	৮০	৭৩	৩৬	৩১	৩০	২১	১৮	১৭
৭৮	৮১	৭৪	৩৫	৩২	২৯	২২	২৩	২৪
৭৭	৭৬	৭৫	৩৪	৩৩	২৮	২৭	২৬	২৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

৮	*	১	-	৫	=	৩
*		+		+		+
২	*	৪	-	৩	=	৫
-		-		-		-
৯	/	৩	+	২	=	৫
=		=		=		=
৭	+	২	-	৬	=	৩

ছোটোদের আঁকা

নাজিবা সায়েম, শ্রেণি 'ও' লেভেল, মাস্টার মাইন্ড স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

মোহাম্মদ ইয়াবুব বর্ণ, নার্সারি শ্রেণি, অক্সফোর্ড প্রি-ক্যাডেট স্কুল, শ্যামপুর, ঢাকা

ছোটোদের আঁকা

সানজিদা আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

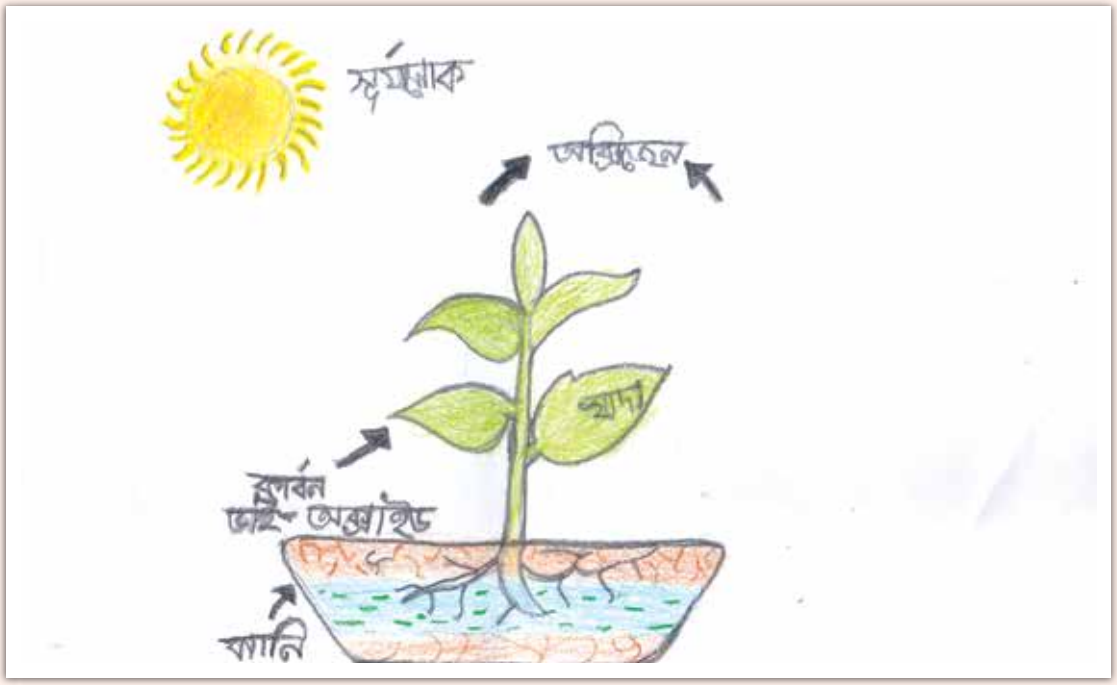

তাশদিদ তাবাসুম আশফিয়া, ৪র্থ শ্রেণি, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মো. রাকিব হোসাইন, ৫ম শ্রেণি, ফসিয়ার রহমান প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা

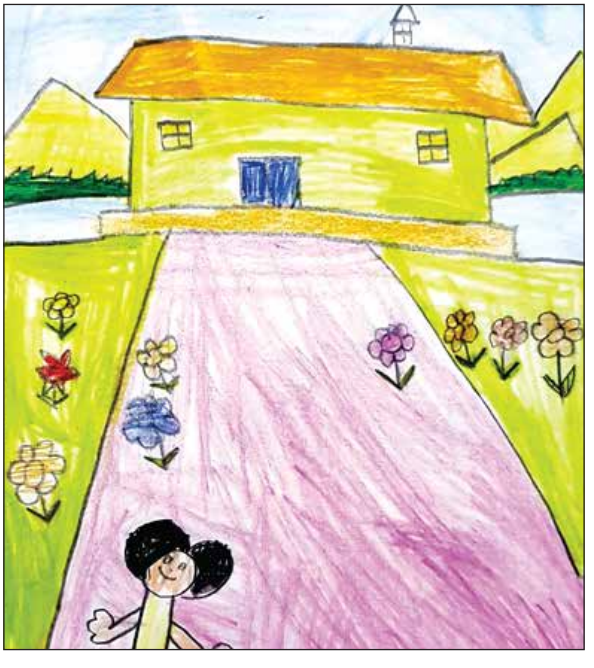

জান্নাতুল আবেদীন হৃদি
নার্সারি শ্রেণি, বটমলী হোম গার্লস স্কুল, ফার্মগেট, ঢাকা

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-46, No-12, June 2022, Tk-20.00

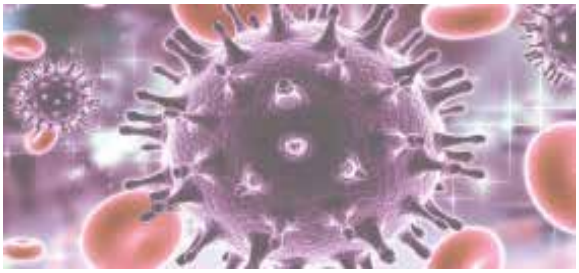

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি
প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা